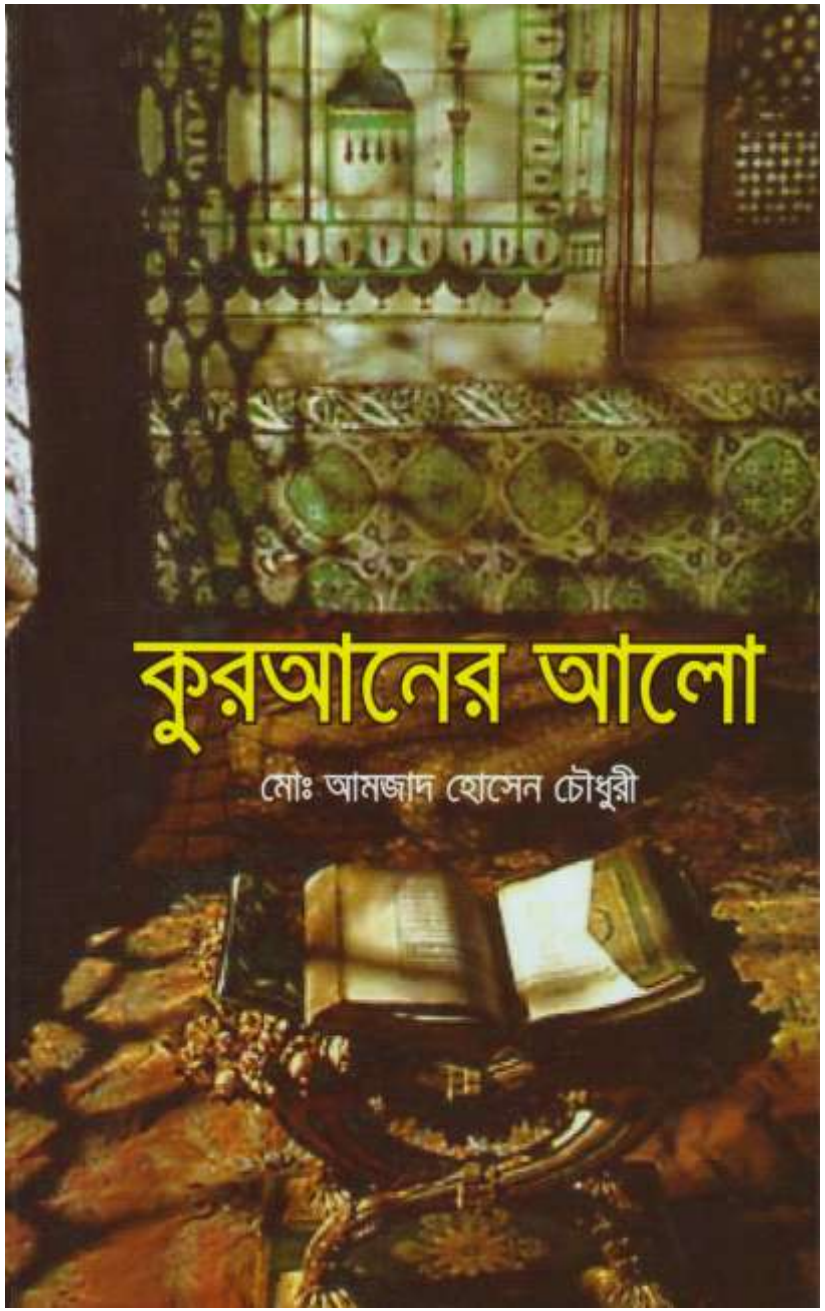

কুরআনের আলো

'ইসলাম : সরল পথ সঠিক আমল'
পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণের অংশ বিশেষ

আল্লাহ তা'আলার বাণী
"আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার উপর আঘাত হানি।
তখন তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়,
আর মিথ্যা হয়ে যায় অপসারিত।"
আল-কুরআন, ২১-সূরা আম্বিয়া : ১৮

আমজাদ হোসনে আরা ট্রাস্ট

কুরআনের আলো
মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী

প্রকাশক
দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ
১১/১ অভয় দাস লেন, মুরাদ সড়ক, টিকাটুলী, ঢাকা
ফোন : ০১৯১৯ ০৩১৯১৭
ই-মেইল : darulhb@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৩

তৃতীয় সংস্করণ
জুলাই ২০১৪

চতুর্থ সংস্করণ
আগস্ট ২০১৪

পঞ্চম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

ষষ্ঠ সংস্করণ
জুলাই ২০১৫

বিক্রয়ের জন্য নয়
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মেমোরি গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
দিগন্ত প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
মতিঝিল, ঢাকা

Quraner Alo, by Md. Amjad Hossain Chowdhury, Published by Darul Hikmah Bangladesh, Dhaka.

For Free Distribution

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিক্ষা ব্যবস্থায় দুটি ধারা প্রচলিত থাকার কারণে আমাদের এ অঞ্চলের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে লেখা ও কথা বলার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরই কর্তৃপক্ষ মনে করে। আধুনিক ধারার শিক্ষিতদের তা মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে এমন ধারণা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, যারা আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের উৎস থেকে ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল ও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সেই জ্ঞান সমাজে বিতরণ করছেন। এ বইটিতে নজর বুলিয়ে মনে হলো, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী তাঁদেরই একজন। তাঁর সাথে স্বল্প সময়ের ব্যক্তিগত আলাপেও তাঁর চিন্তাধারার যথার্থতা উপলব্ধি করেছি।

লেখক কুরআন, হাদীস, ঈমান এবং করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহের যথাযথ তথ্য উপস্থাপন করেছেন সরাসরি কুরআন ও হাদীসের আলোকে। ইসলামকে উপস্থাপন করার এটাই সঠিক পদ্ধতি।

আশা করি, পাঠকবর্গ এ বই থেকে কুরআন সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আমি আরো আশা করি, এ বই পাঠকগণকে জ্ঞানের মূলসূত্র কুরআনের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে।

আল্লাহ হাফেয

আবদুস শহীদ নাসিম
সভাপতি
বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

অভিমত

কুরআনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং যঈফ, মাউযু মাতরূক হাদীসের অনুশীলন ও বহুল প্রচারের ফলে বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ শির্ক ও বিদ'আতের ভয়াবহ বিপদজনক পরিস্থিতির শিকার। ঘুনপোকার ন্যায় শির্ক ও বিদ'আত তাদের ঈমান ও আমলে লুকিয়ে আছে এবং দিবারাত্র ঐ ঘুনপোকা তাদের ঈমান ও আমলকে খেয়ে যাচ্ছে, মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে খেতে খেতে তার ঈমান ও আমলকে খেয়ে খোকলা বানিয়ে রিক্ত হস্তে কবরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। শির্ক, বিদ'আত মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে ঈমানহারা করে ফেলছে, যা মুসলিম সমাজ অনুভবও করতে পারছে না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ ঈমান ধ্বংসকারী কর্মসমূহ থেকে জাতিকে সতর্ক করাও বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি সতর্ক করা যে অত্যন্ত প্রয়োজন তার অনুধাবনও নেই। বাংলাদেশে আড়াই লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে, যার ইমাম ও মুয়াজ্জিনের সংখ্যা কয়েক লাখ, কত লক্ষ আলেম রয়েছে, প্রত্যেকে যদি নিজ দায়িত্ব মনে করে যে, শির্ক ও বিদ'আত থেকে যেভাবে আমার বাঁচা ফরয, এমনিভাবে অন্য ভাই বোনের ঈমান ও আমলকে শির্ক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত রাখার দাওয়াত মুখে-কলমে পেশ করাও প্রত্যেক ঈমানদারের ফরয। বিশেষ করে এর মূল দায়িত্ব সমাজের আলেম ও ইমামগণের। এ দায়িত্ববোধ থেকে এবং মুসলিম সমাজের এহেন মারাত্মক ব্যাধি উপলব্ধি করে আমার পরম বন্ধু ও দীর্ঘদিনের সঙ্গী জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী 'কুরআনের আলো' নামক বইটি সংকলন করেন। আমি কয়েকবার বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। তার বক্তব্য সঠিক বলে আমি মত প্রকাশ করছি।

আসুন আমরা সবাই মিলে সত্যকে প্রকাশ ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করি, সত্যের উপর নিজে অটল থাকি, অন্যকে সত্য আঁকড়ে ধরতে জোর প্রচেষ্টা চালাই। এটাই মুসলিম সমাজের প্রত্যেকের বড় দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমিন!

হাফেজ মাওলানা বশীর আহমাদ
প্রাক্তন খতীব, জামেউল উলুম মাদরাসা মসজিদ
বর্তমান খতীব, নূরে মাক্কা জামে মসজিদ
ইষ্টার্ণ হাউজিং, পল্লবী ২য় পর্ব, মিরপুর ১১, ঢাকা।
পরিচালক, জামিআ' দীনিয়া আশরাফিয়া, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

অভিমত

সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং দরূদ ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কেবল তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। এই ইবাদত-বন্দেগী কীভাবে করতে হবে তা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল ইবাদাতসহ প্রতিমুহূর্তের ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী তা পালন করা। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মানব রচিত কোনো নিয়ম অনুসরণ করা যাবে না।

সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবেই আজ সত্যকে চেনা, জানা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে একরাশ প্রচ্ছন্নতা ও অস্পষ্টতা। প্রায়শই কেন যেন হক বাতিলের সাথে, সত্য মিথ্যার সাথে, হিদায়াত বিভ্রান্তির সাথে এবং ইবাদত বিদ'আতের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। ফলে অনেকেই সত্যের এ সুষম ধারা হতে অনেক দূরে সরে যায়। সত্য কথাগুলো অনেক সময় তাদের নিকট প্রতীয়মান হয় অভিনব ও অপরিচিতরূপে। এহেন মুহূর্তে ওহীর সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানই হলো একমাত্র সঠিক পথ। কেবল ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমেই সকল অন্ধকার ও অনাহূত শক্তির বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে আলোকিত করা সম্ভব।

আল-হামদুলিল্লাহ, কুরআনের আলো বইটি পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। এটি যুগোপযোগী একটি চমৎকার বই। আমি বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চোখ বুলিয়েছি। বইটি পড়ে আমি আল্লাহর রহমতে বেশ উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ এই বইয়ের লেখক জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরীকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন এবং তাকে আরো বেশি বেশি দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দিন।

আমরা যারা এই উপমহাদেশের মুসলমান যাদের অনেকেই বিদ'আত ও শির্কের আমল সম্পর্কে অস্বচ্ছতার মধ্যে নিমজ্জিত, তাদের জন্য এ গ্রন্থখানি এক বিশেষ আলোকবর্তিকা। গ্রন্থখানির সহায়তায় আমরা আমাদের ইবাদতের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী শিক্ষা বিবর্জিত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কুরআন-হাদীস ছেড়ে একদিকে তথ্যসূত্রবিহীন নোটবই পড়ে এবং অন্যদিকে কতিপয় আলেম নামধারী ব্যক্তিদের

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মাস'আলা শুনে এক কঠিন সংকটের ভিতর আবর্তিত হচ্ছি। এ অবস্থার মধ্যে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তাও আমাদের জন্য বোঝা দায় হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে এখনো কিছু সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ও আলেম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত নিয়ম-কানুন পালনে এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে অকুতোভয়ে দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। পালনের জন্য আল্লাহর দ্বীন যে কত সহজ, কত বাস্তবসম্মত, কত বিজ্ঞানসম্মত, কত স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ তা বোঝার জন্য এই গ্রন্থখানি এক অনন্য উদাহরণ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মত ব্যক্ত না করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে মানুষকে দ্বীনের সঠিক পথ দেখানোর তৌফিক দান করুন।

প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনি কাজে তাঁর এই প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এ বইকে তাঁর ও পাঠকদের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। আমীন!

মুহা. তাজুল ইসলাম
গবেষক, কাউন্সিল ফর ইসলামি রিসার্চ
শিক্ষাসচিব, নূরুল উলুম মাদরাসা
খতীব, পরীবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা।

লেখকের কথা

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত দীন ও শরীআতের নামই ইসলাম। যার আওতাধীন রয়েছে পরিপূর্ণ এক জীবনবিধান। এ বিধান মেনে জীবন পরিচালনা অর্থাৎ নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করাটাই হচ্ছে ইবাদত। এবং সঠিক ইবাদতের মধ্যেই নিহিত আছে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি।

কুরআন নাযিল হয় দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছরে। এর একমাত্র কারণ প্রতিটি বিধান নাযিলের পর তা দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করা। দুর্ভাগ্যবশত আজ দুনিয়ার স্বার্থের লোভে আমরা আখিরাতের পরিণাম ভুলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করে চলছি। কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে ইসলামকে আনুষ্ঠানিক নামায, রোযা, বেবুঝ কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ-দরূদ এবং আমলের নামে নানা প্রকার বিদ'আত অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। রাসূলকে ভালবাসার নামে রাসূলের কঠোর নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনীর প্রচার চালু রেখে বিদ'আতি আমল ও শিরকে লিপ্ত হয়েছি। ফলে আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে আমরা আজ তাঁর গজবের শিকার হচ্ছি। এর প্রধান কারণ কুরআনের অজ্ঞতা ও ভুল শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বে জিহাদের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তথাকথিত আলেম তথা মানুষরূপী শয়তানেরা কুরআনের অজ্ঞ যুবকদের বেহেশতে যাওয়ার মিথ্যা নিশ্চয়তা দিয়ে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করতে প্ররোচিত করে। সমাজে ভয়-ভীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। তাদের এসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের ফলে শান্তির ধর্ম ইসলাম আজ বিধর্মীদের কাছে একটি উগ্রপন্থী ধর্ম এবং মুসলমানরা সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত হয়ে ধিকৃত ও অবহেলিত হচ্ছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট যুবকেরা নিরীহ মানুষ হত্যা করে বেহেশতের পরিবর্তে চির জাহান্নামের পথে ধাবিত হচ্ছে। (দেখুন আয়াত ৪:৯৩ এবং ৫:৩২)। এই সংকট থেকে উত্তরণের কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে—মুসলমানদেরকে কুরআনের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তোলা। কেবল কুরআনের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানেরা আবার দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। এটা আল্লাহ তাআ'লার ওয়াদা। (দেখুন আয়াত ২৪:৫৫)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আল্লাহর রহমত পেতে আমাদের ন্যূনতম কী করতে হবে, এ পুস্তকে তারই আলোচনা করেছি। আমি কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এ পুস্তক রচনা করেছি। ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে সাহায্য করা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আলোচিত কোন বিষয় সঠিক নয় কিংবা তার ব্যাখ্যা বা বক্তব্য ভুল বলে প্রমাণ করতে চাইলে কুরআন, হাদীসের দলীলসহ প্রকাশক বরাবর লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করছি। এ বইয়ের কোন বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ঈমান ও মৌলিক আকীদাগত ভুল প্রমাণকারীকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হাদিয়া হিসেবে প্রদান করা হবে।

সত্যতা যাচাই-বাছাই ছাড়াই যারা গতানুগতিক ইবাদত করে যাচ্ছেন, তাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে সহযোগিতা করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ১২টি সূরার বক্তব্য অনুধাবন করলে, কারও সহযোগিতা ছাড়াই এ বইয়ে আলোচিত সকল বিষয়ের/বক্তব্যের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

বইটিতে যারা মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন এবং যারা ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যথাযথ পুরস্কার দান করুন। বিশেষ করে মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বইটি প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন, এটা আমার আন্তরিক দু'আ।

পাঠকবৃন্দ যদি এ পুস্তক পাঠে সামান্যতম উপকৃত হন তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে চলার তৌফিক দিন।

আমীন !

মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী
ঢাকা।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১০

প্রথম অধ্যায়
কুরআন বুঝে পড়ার যুক্তি ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমান ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়
শিরক (অংশীদার করা) ৩৯
বিদ'আত ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়
কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন ৬৪

পঞ্চম অধ্যায়
প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুন্নত ও নফল ইবাদত ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়
দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ ৭৪

উপসংহার ৭৬

একটি বিশেষ অনুরোধ ৭৯

সতর্কবাণী

কুরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ ছাড়াই এ পুস্তকে আলোচিত বক্তব্য সঠিক নয় বলে উপেক্ষা করা মোটেই সমুচিত হবে না।

ভূমিকা

ইসলামের মূল উৎস হচ্ছে আল-কুরআন, যা মহান আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আমাদের জীবনবিধান। এ বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করাটাই হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য বা ইবাদত করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে হলে এবং অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে জানতে হলে নিশ্চয়ই কুরআন বুঝে পড়তে হবে। কেননা না বুঝে কুরআন পড়লে তা থেকে দিক-নির্দেশনা তথা হিদায়াত অর্জন সম্ভব নয়।

মানুষের ধর্মীয় জীবন কেমন হবে, সমাজ জীবনে মানুষ কিভাবে চলবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন নীতির অনুসরণ করতে হবে, হালাল আয় কিভাবে করতে হবে, সঠিক পন্থায় কিভাবে ব্যয় করতে হবে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি, এতিম-মিসকিনের সাথে আচার ব্যবহার কেমন হতে হবে, গরীব দুঃখীদের হক কী হবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং একের উপর অন্যের দায়িত্ব ও অধিকার কী হবে ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাবার নীতিমালা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান দিয়েছেন। যারা অন্যায় কাজ করে তারা তা জেনে বুঝেই করে থাকে। কারণ তাদের ঈমান দুর্বল এবং পরকালের পরিণাম সম্পর্কে তারা উদাসীন। সত্যিকারের খোদাভীতি বা তাকওয়া তাদের মন থেকে তিরোহিত। কুরআন মানুষের মন-মানসিকতায় আল্লাহর বিধি-বিধান অমান্যকারীদের শাস্তির ভয় ও পরকালের জবাবদিহিতার প্রত্যয় সৃষ্টি করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের মনে যদি শেষ বিচারের পরিণাম সম্পর্কে সত্যিকার ভয় থাকে, তবেই সে সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকবে।

বর্তমান সমাজে অনেক আলেম ও ইমাম সাহেব কুরআনের বিধি-বিধানের আলোচনা পরিহার করে এবং দু'আ কবুলের শর্ত উল্লেখ না করে শ্রোতাবৃন্দকে কিছু যঈফ এবং মাওযু হাদীসের আমল দ্বারা কাজের কোনো প্রকার জবাবদিহিতা ছাড়াই অতি সহজে বেহেশতে যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিয়ে পরোক্ষভাবে অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন (২ : ১৫৯ ও ১৭৪ দ্রষ্টব্য)। এর অনিবার্য ফল হিসেবে আমাদের অধিকাংশ মানুষ ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে ভ্রান্ত আমলে লিপ্ত। পরিণতিতে তাদের সকল আমল ব্যর্থ হচ্ছে (১৮ : ১০৩-১০৪)। এর প্রধান কারণ কুরআনের অজ্ঞতা ও ইসলামের নামে নানা ধরনের ভুল শিক্ষা।

কুরআন ইসলাম ধর্মের মূল কিতাব বা পাঠ্যপুস্তক অর্থাৎ Text বই। আল্লাহ বলেন, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম (৫ : ৩)। হাদীস এবং তাফসীর কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। রাসূলের পরবর্তীতে কোনো কোনো হাদীস ও তাফসীর নানা কারণে বিকৃত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে Text বই বাদ দিয়ে কেবল ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে ইবাদতে ভুল হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকবে। কেননা রাসূল (সা.)-এর পরবর্তীতে সমাজ স্বীকৃত কতিপয় স্বার্থপর আলেম ও ইসলামের শত্রু অল্প চেষ্টায় অধিক সাওয়াবের আশা দিয়ে এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অতিরিক্ত ও কৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাসূলের নামে অতিরঞ্জিত কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে নানা প্রকার শির্ক ও বিদ'আতি আমল প্রচলন করে। বর্তমান সমাজের অধিকাংশ আলেম ও ইমাম সাহেব মানুষকে খুশি করার জন্য এ সকল আমলের প্রচার ও পরিচালনা অব্যাহত রেখেছেন। সঠিক ইবাদতের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন ব্যতীত কোনো বিকল্প নেই। তাই এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে কুরআন বুঝে পড়ার যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কথায় বলে 'ঈমান নাই যার, ধর্ম নাই তার', অর্থাৎ ঈমানবিহীন আমলের কোনো মূল্য নেই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শির্ক ও বিদ'আতি আমল ইসলামের খুবই স্পর্শকাতর বিষয়, যা পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থ বিকৃতির মূল কারণ এবং ইবাদত কবুলের প্রধান অন্তরায়। অথচ আজ কুরআনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে শির্ক ও বিদ'আতের আমল আমাদের সমাজে শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্যই তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন কিভাবে হতে পারে তা নিয়ে চতুর্থ অধ্যায় সাজানো হয়েছে।

একজন খাঁটি মুসলমানের প্রতিদিনের কিছু সুন্নত ও নফল ইবাদতের উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। যার সঠিক প্রয়োগে আল্লাহর নৈকট্যলাভের পথ সহজ হবে।

আমরা প্রতিদিন নামাযে এবং সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একাকী ও সমবেতভাবে দু'আ করে থাকি। অবশ্য একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি, আমাদের দু'আ কবুল হচ্ছে না। এর কারণ অত্র বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

আশা করি এ পুস্তক আপনার দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মের এবং সঠিক ইবাদতের সহায়ক হবে, ইনশা-আল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়
কুরআন বুঝে পড়ার যুক্তি

আল-কুরআন হচ্ছে বিশ্বজগতের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালকের বাণী। যা জিবরাঈল (আ.) ওহীয়ে মাতলু তথা পঠিতব্য ওহী যা নামাযে কিরাআত হিসাবে অবশ্যই পড়তে হয় (হাদীসও ওহী গায়রে মাতলু কিন্তু তা নামাযে কিরাআত হিসেবে পড়া যায় না)—এমন জাজ্বল্যমান ওহী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন এবং রাসূল (সা.) সেগুলোর শব্দ ও বাক্য হুবহু পাঠ করে হিফাযত করেন। কুরআন মানুষকে 'সরল পথের নির্দেশ দান করে আর সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।' (১৭ : ৯)

যুগে যুগে মানুষের নিকট রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন (২ : ৩৮-৩৯)। তারই ধারাবাহিকতায় স্পষ্ট নিদর্শনসহ সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা আল-কুরআন, "যাতে তিনি তা মানুষকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেন এবং তারা চিন্তা করে।" (১৬ : ৪৪)

প্রত্যেক নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত বাণীর সারমর্ম একই ছিল এবং তাঁরা তাঁদের কওম (সম্প্রদায়)-এর নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ দেখান এবং তাঁর বিধান বিবৃত করেন। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছিলাম আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাঁদের নিকট নাযিল করেছিলাম কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ কায়েম করে।" (৫৭ : ২৫)

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" (৩৩ : ৪০)

একমাত্র তিনিই প্রেরিত হন সমগ্র মানব জাতির জন্য। আল্লাহ বলেন, "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না।" (৩৪ : ২৮)

মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূলের প্রতি আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে বলেন, "বলো! আমার কাছে এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদের সতর্ক করি এবং তাদেরও, যাদের কাছে এটা পৌঁছবে।" (৬:১৯, ২:১৫১-১৫২)

আল কুরআন জীবনের সকল বিষয়ে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি এবং ইহকাল-পরকালের কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়। আল কুরআনই হলো আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, রিসালাতের মর্যাদা, কিয়ামত ও পরকালীন জবাবদিহিতা এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে জানার মূলসূত্র। এ কিতাবের মধ্যেই মানুষ খুঁজে পাবে তার দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি ও পরকালের মুক্তির পথ এবং লাভ করতে পারবে সত্য সঠিক জীবন-বিধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি একমাত্র কিতাব, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য জীবনযাপন পদ্ধতি।" (২ : ২)

"এটি সেই কুরআন, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসবে।" (১৪ : ১)

যে কোনো বই-পুস্তকের মতই আল্লাহর এ কিতাব বুঝে পাঠ করা ও তার মর্ম উপলব্ধি করা সকল মুসলমানের কর্তব্য, যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর নির্দেশ, উপদেশ বাস্তবায়ন করা যায়। আল্লাহ বলেন, "এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট দলিল এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ।" (৩:১৩৮)

"এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হতে পার।" (৬ : ১৫৫)

"এ কুরআন এক কল্যাণময় উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি, তবুও কি তোমরা এটা অস্বীকার করবে?" (২১ : ৫০)

"এ কুরআন মানুষের জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (৪৫ : ২০, ১৪ : ৫২, ২৭ : ৭৭)

"এ কুরআন সমগ্র জগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।" (৬৮ : ৫২; ৩৮ : ৮৭)

আল্লাহ আরও বলেন, "আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত তথা জীবন যাপনের নিয়ম-বিধান আসবে। যারা আমার দেয়া হিদায়াত অনুসারে জীবন যাপন করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না।" (২ : ৩৮)

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজ বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলমান, বিশেষ করে আমাদের এ উপমহাদেশের অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই কুরআনের মর্মবাণী সম্বন্ধে অবহিত নন। কেননা, আমাদের অধিকাংশ মুসলমান ভাই-বোনেরা কুরআন পড়তে পারেন বটে, কিন্তু আরবী ভাষা না জানার কারণে এর

অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ। দুঃখের বিষয়, তারা তা বুঝার চেষ্টাও করেন না। কোনো সূরা বা আয়াতে কত সাওয়াব তা জানার ও চর্চা করার আগ্রহ প্রায় সকলের মধ্যে আছে, কিন্তু সে সূরা বা আয়াতে কী বলা হয়েছে তা জানার বা বুঝার কোনো প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেন না। আল্লাহ বলেছেন, "যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা পড়ে (অর্থাৎ বুঝে পড়ে) তারাই তাতে বিশ্বাস করে।" (২ : ১২১)

কুরআন যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে হলে অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের মত এর মৌলিক বিষয়গুলো অর্থাৎ জীবন-বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বা আলোচনা করে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। আর উপমাগুলো থেকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অমান্য করার পরিণাম বুঝতে হবে। অন্যথায় কুরআন নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ বলেন, "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" (৪৭ : ২৪)

কুরআনের সঠিক বাস্তবায়নের চেষ্টা করাটাই হচ্ছে—সিরাতুল মুস্তাকিম অর্থাৎ হেদায়াতের পথ। এই পথ যারা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। (২ : ২৫৭, ৪৭ : ১৭)। যারা তা করে না শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। (২ : ২৫৭, ৪৭ : ২৫-২৬)

আল কুরআন বুঝে না পড়ার ফলে আজ মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের সাথে কুরআনের বাণীর কোনো মিল পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, "তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা রাখবে।" (৩ : ১০৪, ১১০)

অথচ মুসলমানরা আজ অজ্ঞতাবশত কুরআনের আদেশ-নিষেধ অমান্য করায় আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার ফলে এর উল্টো কাজ করে এ দুনিয়ায় নিকৃষ্ট জাতি বলে ধিকৃত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-উপদেশ যথার্থরূপে না বুঝার কারণে তা উপেক্ষা করে ভ্রান্ত পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। (২ : ২৫৬, ৩ : ১০৫, ৬ : ১৫৯) ফলে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের জন্য বিধর্মীরা ইসলাম ধর্ম ও রাসূলের শিক্ষাকে দোষারোপ করে রাসূলকে শয়তানের সাথে তুলনা করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে (নাউযু বিল্লাহ)। প্রকাশ্যে কুরআন

পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

সুধী পাঠক! সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে থাকায় মুসলমানরা আজ পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। কুরআনের আয়াত ৪ : ৯৩ ও ৫ : ৩২ এবং এ সংক্রান্ত রাসূলের বক্তব্য (হাদীস) পর্যালোচনা করে একটু ভেবে দেখুন, জিহাদের নামে যারা মসজিদ, রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, সভা-সম্মেলন ও গাড়ি-বাড়িতে আত্মঘাতি বোমা হামলা চালিয়ে নিরীহ লোকজনকে হত্যা করছে, তাদের পরকালের পরিণাম কী হতে পারে? আপনি নিজের দেশের মুসলমানদের চরিত্র পর্যালোচনা করে আমার সাথে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এর প্রধান কারণ কুরআনের অজ্ঞতা ও ভুল শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে আজ মুসলমানদের ঈমান দুর্বল। অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, জুলম ও হারাম উপার্জনে তারা অগ্রগামী। এ দুনিয়ার সুখ আহলাদ ও প্রাচুর্যের লোভে তারা পরকালের জবাবদিহিতা সম্পর্কে উদাসীন (২৮ : ৬০, ১০২ : ১-৮)। আল্লাহর বাণীর উপর তাদের কোনো আস্থা নেই। তারা হারাম উপার্জনে লিপ্ত থেকে গোনাহ মাফ ও কল্যাণের আশায় শির্‌কি ও বিদআতি আমলে অভ্যস্ত। এদের পরিণতি সম্পর্কিত আয়াত ১৮ : ১০২-১০৪ দ্রষ্টব্য। এছাড়া নিজ গদি রক্ষার লক্ষ্যে কুরআনের উপদেশবাণী উপেক্ষা করে মুসলিম দেশের শাসকগণ একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিধর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। (৫ : ৫১-৫২)

অথচ প্রকৃত ঈমান চর্চা ও সৎকর্মের অনুশীলনের ফল হিসেবেই যে মুমিনদের পৃথিবীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মী তাদের আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দেবেন এবং তাদের জন্য মনোনীত দীন প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির বদলে দেবেন শান্তি ও নিরাপত্তা।" (২৪ : ৫৫, ২১ : ১০৫-১০৬)

বর্তমান যুগের মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়, তারা ইসলামের নামটুকুই শুধু ধরে রেখেছে। তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদির কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। তারা আজ মানব সৃষ্টির সূচনাতে ফেরেশতাদের বক্তব্য (২ : ৩০) ও পরবর্তীতে শয়তানের ওয়াদা (৭ : ১৬-১৭, ১৫ : ৩৯-৪৩) বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কিভাবে আল্লাহর রহমত আশা করা যায়? (দেখুন, আল-কুরআন ৭ : ৯৬ এবং ৩৫ : ৬)

জাহেলিয়াত (অজ্ঞতা) বা ইসলাম-পূর্ব যুগের অশিক্ষিত বর্বর বলে পরিচিত মরুচারী আরবরা কুরআনের আলোকে জীবন গঠন করে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পারস্য, রোমান ও অন্যান্য শক্তিশালী সাম্রাজ্য বশীভূত করে বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মানব সভ্যতার সমৃদ্ধি সাধনে তাদের অবস্থান তুলনাহীন।

কুরআনের শিক্ষা চিরন্তন-শাশ্বত। সমস্যাতাড়িত আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে কুরআনের প্রয়োজন সর্বাধিক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কুরআন আজ কেবল পবিত্র গ্রন্থরূপে সমাদৃত। বালা-মসিবতে, ওয়াজ-নসীহতে, সভা-সম্মেলনের শুরুতে, চেহলাম ও মিলাদে ভক্তিভরে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি করা হয়, কিন্তু কী আবৃত্তি করা হয় তা কেউ বুঝতে চায় না এবং বুঝলেও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে না। তাই আজ বড় প্রয়োজন কুরআন বুঝার ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার। কুরআন রেহাল বা তাকে সাজিয়ে রাখার বস্তু নয়, কুরআনের স্থান হওয়া উচিত হৃদয়ে, দৈনন্দিন জীবনে তথা কাজে-কর্মে।

সেদিন সাহাবায়ে কিরাম লিখিত কুরআনকে শুধু বুকে ধারণ করে ও তা সংরক্ষণ করে বিশ্বে বরেণ্য হননি, হয়েছিলেন কুরআনের পবিত্র বাণীর বাস্তবায়নের ফলে। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন কুরআনের মর্মবাণী এবং গড়েছিলেন সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন। তাঁদের কাছে রাসূলের জীবনাদর্শ ও কুরআনের বাণী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কুরআনও ছিলো শুধু মুখে মুখে। হাদীস তখনো সংগৃহীত হয়নি। ফিক্‌হ, উসূল, তাফসীর বিষয় নিয়ে সে যুগে কেউ আলাদাভাবে চিন্তাও করেনি। এসবই পরবর্তী সময়ের উদ্ভাবন।

মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মত আল্লাহর নাযিলকৃত মূল ধর্মগ্রন্থ থেকে সরে গিয়ে বানোয়াট হাদীস ও তাফসীরের উপর ভিত্তি করে রচিত বিভিন্ন কিতাব থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত হয়ে ভ্রান্ত আমলে জড়িয়ে পড়ে। কুরআন শুধু সুর করে আবৃত্তির জন্য নাযিল হয়নি। এটা হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জনের জন্য আল্লাহর প্রণয়নকৃত আমাদের জীবনবিধান। মানুষের চলার পথে যা কিছুর প্রয়োজন, সমাজ জীবনে যা কিছু অপরিহার্য, পবিত্র কুরআনে সে সকল সমস্যার উল্লেখ, তার সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত সমাধানের বিস্তারিত উপদেশ-নির্দেশ আছে। সত্যি বলতে কি, পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যার উল্লেখ কিংবা সমাধান পবিত্র কুরআনে নেই।

কুরআন বাস্তবায়নের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। তাই আল্লাহ তাআ'লা কুরআন বুঝা সহজ করে দিয়েছেন। (দেখুন আয়াত ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)। আর কুরআনে ৩টি শব্দের মাধ্যমে আমাদেরকে কুরআন বুঝে পড়ার জন্য একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছেন। (দেখুন আয়াত ১৮ : ২৭, ২৯ : ৪৫, ২ : ১২১)।

শব্দ ৩টি অতি পরিচিত, যেমন—১. তিলাওয়াত, ২. ক্বিরআত, ৩. রাতালা, যার প্রত্যেকটিরই আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বুঝে পাঠ করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ শব্দগুলোর ভুল ব্যাখ্যার কারণে আমরা আজ কুরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অধিকাংশের ধারণা—শব্দগুলো দ্বারা সহীহ উচ্চারণে ও সুমধুর সুরে বেবুঝ কুরআন আবৃত্তিকে বুঝায়। প্রকৃত অর্থে সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও অর্থ অনুধাবনের সমন্বয়ে পাঠ করাই হচ্ছে তিলাওয়াত বা ক্বিরআত করা। সূরা মুযাম্মিলের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে—"ওয়ারাত্তিলিল কুরআনা তারতিলা" অর্থাৎ রতল (বুঝে বুঝে পাঠ) কর, স্পষ্ট করে, ধীরে ধীরে। কুরআনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত "ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক" (সূরা 'আলাক, আয়াত: ১)। অর্থ হচ্ছে—"পড়! (বুঝে শুনে) তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" কুরআন বুঝে পাঠ করা সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, "কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বুঝে পড়া।"

কুরআন-সুন্নাহর আদেশ/নিষেধ জেনে ও তা মেনে জীবন পরিচালনা করাটাই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত যা একজন মুমিনের লক্ষ্য। তাই কুরআন বুঝার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অথচ ভাষা না জেনে কেবল পড়তে পারলে এর মর্মবাণী জানা অসম্ভব। কুরআন পাঠককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা সম্পর্কে পরিষ্কার বলে দেয়। যার উপর ভিত্তি করে আমাদের মনে অন্যের উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রচিত হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমানই কুরআন পাঠ করেন কেবল আরবীতে না বুঝে, অথচ হাদীস এবং তাফসীর পড়েন নিজ ভাষার অনুবাদ বা তরজমায়। এর অন্যতম কারণ, অনেকেই বলে থাকেন—আল-কুরআনের অনুবাদ মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার, অতএব আল-কুরআনের তরজমা পড়া ঠিক নয়। আরও বলা হয়, সহীহ উচ্চারণ ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত জায়েজ নয়। রাসূলের যুগে কুরআনের বার্তা প্রচারে ভাষার প্রশ্ন বা উচ্চারণ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। রাসূল (সা.) কুরআন পাঠের জন্য আরবী ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক

ভাষাকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি অনুবাদকের মাধ্যমে অন্যান্য ভাষাভাষীদের কাছেও তাদের মাতৃভাষায় আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সহীহ্ উচ্চারণের প্রচলন ও তার জন্য যের, যবর, পেশের ব্যবহার চালু হয় রাসূলের পরবর্তী যুগে।

কুরআনে অন্যান্য নবীদের যে সকল বক্তব্য ও কথপোকথন এবং দু'আর উল্লেখ আছে, তা নবীগণ তাদের কওমের কাছে এবং আল্লাহর দরবারে নিজেদের মাতৃভাষাতেই পেশ করেছিলেন, আরবীতে নয়, (১৪ : ৪)। আমরাও আমাদের নিজস্ব দু'আ বাংলাতে করে থাকি। কুরআন ও হাদীসের দু'আ শুধু না বুঝে তোতাপাখীর মতই আউরিয়ে থাকি। আসলে ভাষা বা সুরের চেয়ে বার্তার বিষয়বস্তু জানাটাই অধিক প্রয়োজনীয়। এ সত্য উপলব্ধি করলে কুরআন বুঝে পড়ার যুক্তি ও গুরুত্ব সবাই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য নামায যেমন আরবীতে আদায় করতে হবে, তেমনি কুরআন ও হাদীসের দু'আ কেবল কুরআনের ভাষা আরবীতেই করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থ জেনে তা করলে সঠিক দু'আ অন্তর থেকে করা সম্ভব হবে।

উপরিউক্ত বক্তব্যের যথার্থতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়, যদি আমরা লক্ষ্য করি, বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে শত শত বিধর্মী প্রতিবছর ইসলাম গ্রহণ করছেন। তারা সুমধুর সুরে কুরআন আবৃতি শুনে নয় বরং অনুবাদ পড়ে কুরআনের বাণীর বাস্তবতা ও সত্যতা উপলব্ধি করেই তা করছেন। এমনকি জ্বিনদের একদল কুরআনের বাণী শুনে তার সত্যতা উপলব্ধি করে তাতে ঈমান আনে (৭২ : ১-২, ৪৬ : ২৯-৩১)

এছাড়া বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অনারব ধর্ম বিশারদ ও প্রচারক যেমন—আহমদ দীদাত, ডা: জাকির নায়েক প্রমুখ আরবী ভাষায় দক্ষ নন। তাদের জ্ঞানের সূত্র কুরআনের অনুবাদ। বাংলাদেশের আলেম ও ইমাম সাহেবরা; যারা কুরআন, তাফসির এবং হাদীস নিয়ে সমাজে আলোচনা করেন, তাদের অধিকাংশই আরবী ভাষা জানেন না।

পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনি শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের অনুবাদ অধ্যয়ন করেছেন। আরবী ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক, গল্প উপন্যাস, বিশেষ করে কুরআনের তাফসির ও হাদীসের অনুবাদ পড়েছেন, এমনকি এখনও পড়ছেন। একমাত্র কুরআন মাজীদের অনুবাদ নিয়েই যত সংশয় ও বিতর্ক। অথচ আমাদের কর্তব্য আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত জীবনবিধান জানার জন্য

কুরআনের তরজমা অধ্যয়ন করা ও অপরকে অধ্যয়নে উৎসাহিত করা। এ সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ৩ : ১০৪ এবং ৪১ : ৩৩ দ্রষ্টব্য।

কুরআনের প্রথম আয়াত হচ্ছে, "তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (৯৬ : ১)

অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর। আমরা দুনিয়ার যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে তা প্রথমে বুঝার চেষ্টা করি, কিন্তু আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে তার দরকার হয় না। কেননা, কুরআন আরবীতে শুধু সুমধুর সুরে সহীহ উচ্চারণে আবৃতিতে সব ফযীলত, আল্লাহর রহমত ও সাওয়াব নিহিত আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অথচ আল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সব প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা বধির, বোবা, যারা বুঝে না।" (৮ : ২২)

জাহান্নামবাসীরা বলবে, "যদি আমরা নবী-রাসূলদের (অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের) কথা শুনতাম, অথবা (তা বুঝার জন্য) বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমাদের আজ জাহান্নামবাসী হতে হতো না।" (৬৭ : ১০)

আল্লাহ 'আকল' (বিবেক-বুদ্ধি) শব্দটি কুরআনে মোট ৪৯ বার ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি প্রধানত ব্যবহার করেছেন হয় বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআনের বক্তব্য বুঝার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য; আর না হয় ঐ কাজে বিবেক বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্য। আমাদের অনেকের ধারণা, আরবী ভাষায় আল-কুরআন শুধু পড়াই মুসলমানের কর্তব্য; বুঝাটা তত প্রয়োজনীয় নয়, যেহেতু আল্লাহ ওটা আরবী ভাষাতেই নাযিল করেছেন। আমাদের সমাজের অনেক আলেম ও ইমাম সাধারণ মুসল্লীদের কুরআনের বাংলা অনুবাদ পড়তে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলেন, আরবী আল্লাহর ভাষা এবং বেহেশতের ভাষা, তাই কুরআন কেবল আরবীতে পড়াই যুক্তিসঙ্গত (৪১ : ৪৪)।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সকল ভাষাই আল্লাহর বিশেষ দান। তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ৪ খানা আসমানী কিতাব (১) **কুরআন** নাযিল হয়েছে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আরবী ভাষায়; (২) **তাওরাত** নাযিল হয়েছে মূসা (আ.)-এর উপর ইবরানী তথা হিব্রু ভাষায়; (৩) **যাবুর** নাযিল হয়েছে দাউদ (আ.)-এর উপর ইউনানী ভাষায়; (৪) **ইঞ্জিল** নাযিল হয়েছে ঈসা (আ.)-এর উপর সুরইয়ানী ভাষায়। তিনি ভাষাতে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন যাতে একে অপরকে চিনতে পারে বা বুঝতে পারে। ভাষা, বর্ণ বা গোত্রের তারতম্যে শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

কে আরবী ভাষায়, আর কে বাংলা ভাষায় কথা বলে, এটা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয়; শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো আল্লাহভীতি বা তাকওয়া (এ প্রসঙ্গে সূরা রূমের ২২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)।

আমাদের রাসূল (সা.)-এর ভাষা আরবী। আল্লাহ বলেন, "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।" (১৪ : ৪, ৪১ : ৪৪)

আল কুরআনের ভাষা আরবী হওয়া সম্পর্কে বলেন, "আমি কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (১২ : ২, ৪৩ : ৩)

"এ একখানা কিতাব, এর আয়াতসমূহ পঠিত আরবী ভাষায় বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।" (৪১ : ৩-৪)

"আমি তো তোমার ভাষায় এ কুরআন সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এটা দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।" (১৯ : ৯৭)

"আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি, আর এর মধ্যে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি, যাতে ওরা ভয় করে ও স্মরণ করে।" (২০ : ১১৩)

"আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে সতর্ক করতে পার; যার সংঘটন সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।" (৪২ : ৭)

"আমি তোমার ভাষায় একে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (৪৪ : ৫৮)

আল্লাহ আরও বলেন, "আমি আমার বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি এবং এতে কোনো জটিলতা বা বক্রতা রাখিনি।" (১৮ : ১)

"এটি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন, যার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।" (৩৯ : ২৮)

কিন্তু না বুঝে পড়ার কারণে আমরা আজ আল্লাহর এ বাণীগুলো যেন অবিশ্বাস বা অস্বীকার করছি; যেহেতু আমাদের ধারণা, কুরআন বুঝা খুব কঠিন, এটা এক মহা জটিল গ্রন্থ। একথা সত্য যে, কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে ও চর্চা করতে হবে আরবী ভাষায়; না হয় কুরআন পড়া হচ্ছে বলা যায় না। একই সঙ্গে

আরবী ভাষা জানা না থাকলে নিজ ভাষায় তরজমা করে পড়ে কুরআন বুঝতে হবে; না হয় কুরআনের উপদেশ বাস্তবায়ন করা যাবে না। অর্থাৎ কুরআনের মূল উদ্দেশ্য বিফল হবে। বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য যে উপদেশ-নির্দেশ পাঠিয়েছেন তা নিজ ভাষায় পড়লে নিশ্চয়ই কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "আমি এ কুরআনের মধ্যে মানুষের জন্য নানাভাবে বিভিন্ন উপমা-উদাহরণ বর্ণনা করেছি।" (১৭ : ৮৯)

"এ কুরআন এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (৩৮ : ২৯)

"আমি মানবজাতির জন্য এ কুরআন সর্বপ্রকার দৃষ্টান্তসহকারে নাযিল করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (৩৯ : ২৭)

"মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে, পথনির্দেশ, সুখবরদাতা হিসাবে তোমার উপর এ কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" (১৬ : ৮৯)

উপরোক্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায়, শুধু বেবুঝ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা নয়, বরং কুরআনের বিধি-বিধানকে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করার শিক্ষাটাই ইসলামী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আসলে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে কুরআনের আবির্ভাব। কুরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—

১. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার কথা শিক্ষা দেয়া;
২. পরিপূর্ণ ও সঠিক জীবনবিধানের মাধ্যমে মানব জাতিকে অন্ধকার, শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার বা ইসলামপূর্ব পথ থেকে ইসলাম নির্দেশিত আলোর পথে আনা;
৩. সমাজে অন্যায় প্রতিরোধ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বোধশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আদেশ, নিষেধ ও উপদেশমূলক বাণী প্রেরণ করা;
৪. ইসলামের ৫টি স্তম্ভের গুরুত্ব বর্ণনা করা;
৫. কিয়ামতের দিন দুনিয়ায় কৃত সকল কর্মের জবাবদিহিতা ও তার পরিণাম সম্পর্কে মানব জাতিকে সচেতন বা সতর্ক করা।

আল্লাহ বলেন, আমি কুরআনে অনেক বিষয় বার বার বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (১৭ : ৪১)

"আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

সত্যি বলতে কি, আমরা কুরআন পড়ি বা মুখস্থ করি কেবল সাওয়াবের আশায়, উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের বিশ্বাস, কুরআনের উপদেশবাণী বুঝার প্রয়োজন নেই, কেবল তিলাওয়াতের জন্য সুন্দর সুর আর সহীহ উচ্চারণের দরকার। এর প্রধান কারণ, আমাদের অধিকাংশই কোনো প্রকার যুক্তি প্রমাণ ছাড়া ধর্মের উপর অন্ধ বিশ্বাস করে তার উপর আমল করে থাকে। আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, ধর্মশাস্ত্র যুক্তির উর্ধ্বে। অথচ আল্লাহ বলেন, "তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও যুক্তি দিয়ে ডাক আর আলোচনা করো উত্তম পন্থায়।" (১৬ : ১২৫)

আমাদের আরও ধারণা, আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য ধর্ম নির্ধারিত করে তাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। যেমন আমরা মুসলমান, কারণ আমরা মুসলিম পরিবারে জন্মেছি। একজন খ্রিস্টান, কেননা তার পরিবার খ্রিস্টান। অপর একজন হিন্দু যেহেতু সে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। সবাই যে যার ধর্ম অনুসরণ করে যা তার পরিবার ও সমাজের সকলের সাথে সম্পৃক্ত, সেখানে নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন হয় না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "ওদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না! আমাদের পূর্বপুরুষদের যেমন দেখেছি আমরা তারই অনুসরণ করব।" (২ : ১৭০, ৩১ : ২১, ৪৩ : ২২)

আমরা কেবল দুনিয়া বা পার্থিব বিষয়ে নিজেরা বুঝার ও জানার চেষ্টা করি এজন্য যে, নচেৎ আমরা এ দুনিয়ায় কৃতকার্য হতে পারব না। কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে হুজুরদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করি। সেক্ষেত্রে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য মনে করি, যেহেতু আমাদের ধারণায় তাঁরা এ বিষয়ে জ্ঞানী। পক্ষান্তরে আমাদের বুঝার ক্ষমতা বা নিজে পড়ে জানার ধৈর্য ও সময় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষের মধ্যে যারা (কর্মে অথবা মুখে) বলে, হে আল্লাহ, আমাদের ইহকালে কল্যাণ প্রদান করুন, বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশ (কল্যাণ) নেই।" (২ : ২০০, ১১: ১৫-১৬)

যাই হোক, কুরআনের ১১৪টি সূরার মোট ৬২৩৬ আয়াতের মধ্য থেকে মাত্র ৫০০-এর মতো আয়াত হচ্ছে শরীয়ত বা ইসলামী জীবনবিধান সংক্রান্ত। হাজারখানেক আয়াতে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ এই সকল আয়াত (মুহকাম) নিয়েই আলোচনা ও গবেষণা করতে জ্ঞানী সম্প্রদায়কে উপদেশ

দিয়েছেন। বাকি অনেক আয়াত অতীতের ঘটনাবলি, উপমা হিসেবে যার উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সকল আয়াত হচ্ছে মুতাশাবিহাত। আল কুরআনের সব আয়াতকে আল্লাহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—এক. 'আল-মুহকাম' অর্থাৎ সুদৃঢ় বা অনড় বিধান সম্পৃক্ত সুস্পষ্ট অর্থবহুল বাণী, দুই. 'মুতাশাবিহ' তথা দ্ব্যর্থবোধক বাণী। আল্লাহ নিজেই এসব আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। (৩ : ৭)

কুরআন বুঝে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, কোন্ আয়াতগুলো 'মুহকাম'। কেননা এগুলো দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট এবং উপদেশমূলক। আল্লাহ সকল কওমের নবীর কাছেই এ মুহকাম আয়াত নাযিল করেছেন। পার্থক্য শুধু মুতাশাবিহের। তাই সূরা বাকারার ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুত্তাকী (সংযমী) খোদাভীরু তথা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনকারী তারাই—যারা কুরআন ও তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।" (২ : ৪)

"(হে মুহাম্মদ!) তোমাকে তো সে কথাই বলা হয়, যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের বলা হয়েছে।" (৪১ : ৪৩; ২ : ৮৩ এবং ১০ : ৯৪ ও সূরা আশ ৪২ : ১৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ আরো বলেন, "এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার উপর আল কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি।" (৫ : ৪৮)

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তীতে সকল ধর্মগ্রন্থের মৌলিক ও ধর্মীয় ভাবধারা এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ বাদ দিয়ে স্বার্থান্বেষী আলেমগণ মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার সাহায্যে তাদের খেয়াল-খুশীমত ধর্মগ্রন্থগুলোতে যোগ-বিয়োগ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বিকৃতি ঘটায়। আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম তাদের প্রতি যারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত। যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছে।" (১৫ : ৯০-৯১, ৩০ : ৩২)

তাই আল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য শেষ বারের মতো আমাদের রাসূলের মারফত তাঁর আদেশ-নিষেধসহ কুরআন নাযিল করেন এবং নিজেই এর রক্ষার ভার গ্রহণ করেন, যাতে আর কখনো কেউ এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে না পারে। তাই আজও কুরআনের প্রতিটি উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি তথা অক্ষর, শব্দ অবিকল হুবহু অপরিবর্তিত রয়েছে। লন্ডনের British Museum এবং সমরখন্দে

রক্ষিত ১৪০০ বছর আগের হাতের লেখা কুরআনের সাথে পৃথিবীর যে কোনো দেশের ছাপা কুরআন শরীফ নিয়ে যাচাই করলে যে কেউ এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন। আল্লাহ বলেন, "আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।" (১৫ : ৯, ৭৫ : ১৭)

যদিও কুরআনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাণী সব সময়ই অপরিবর্তিত আছে এবং থাকবে, কিন্তু না বুঝার ফলে আজকের মুসলমান সমাজ এর মূল বাণী থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, সমাজের অধিকাংশ আলেম এবং ইমাম সাহেবরা সকল প্রকার ধর্মীয় আলোচনায় কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সাধারণ মুসলমান কুরআনের পরিবর্তে হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন করে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে অধিক সচেষ্ট। কুরআনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং কিছু যঈফ বা জাল হাদীসের বহুল প্রচারের ফলে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় আমাদের ধর্ম আজ বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, তারপর যারা এর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তারা নিশ্চয়ই সীমাহীন অবাধ্যতায় আছে।" (সূরা ২ : ১৭৬)

আল্লাহ আরও বলেন : "তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য আছে দুঃখজনক শাস্তি।" (সূরা-৩ : ১০৫, ৬ : ১৫৯)

রাসূল (সা.) বলেন : "ইহুদী সম্প্রদায় একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় হয়েছিল বাহাত্তর ফিরকায়। আমার এই উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর ফিরকায়। তন্মধ্যে একটি ব্যতীত সবগুলো দলই জাহান্নামে যাবে। তখন সাহাবীগণ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), সেটি কোনদল হবে? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, যে দল কেবল আমার ও আমার সাহাবীদের নীতির উপর চলবে" (শিরক ও বিদ'আতমুক্ত ইবাদত করবে)। (বুখারী-মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য জাহান্নামী বাহাত্তর দল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা এবং অন্যদের এর থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেওয়া।

আল্লাহ বলেন, "আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।" (১৬ : ৬৪)

রাসূল (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি হচ্ছে কুরআন এবং অপরটি হচ্ছে আমার সুন্নাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।"

ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে অথবা সাওয়াবের আশায় কোনো কাজ বা আমল করার পূর্বে তা শিরক ও বিদ'আতমুক্ত এবং কুরআন-হাদীসের অন্তর্ভুক্ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত কিনা তা যাচাই করে নিলেই জাহান্নামী বাহাত্তর দল থেকে মুক্ত থাকা যাবে। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানই আমাদের তা করতে সাহায্য করবে।

আমরা যারা কুরআন পড়তে ও বেবুঝ আবৃত্তি করতে পারি, তারা এখন কুরআনের তরজমা পড়ে তার বক্তব্যগুলো বুঝার চেষ্টা করি অর্থাৎ তিলাওয়াত করি, যাতে তা সঠিকভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পাথেয় হয় এবং আমরা আল্লাহর নির্দেশ উপদেশ বিশুদ্ধভাবে পালন করার চেষ্টা করতে পারি। যদি তাই করি, তবে কি আমরা আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারি না?

আমাদের সমাজের শিক্ষিত ও বিবেকবান মুসলমানদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা যেন অন্ধের মত আলেম ও ইমাম সাহেবদের বক্তব্যের অনুসরণ না করে নিজেরা অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের মত কুরআনের তরজমা পাঠ করে তার বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। অর্থ বুঝে কুরআন পড়লে বা কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করলে কেউ আর আপনাকে কোনো আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে বা কুরআন হাদীস বহির্ভূত যঈফ বা মাওযু হাদীসের বক্তব্য অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা বা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কুরআনের জ্ঞান আপনার ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দেবে, যা সকল প্রকার ইবাদত বিশেষ করে হাদীসের বক্তব্যের সঠিকতা নির্ণয়ে ও মূল্যায়নে যথাযথ সহায়ক হবে। একমাত্র কুরআনের জ্ঞানই আপনাকে সরল সঠিক পথে চলতে সাহায্য করতে পারে (৩৯ : ৪১)। আল্লাহ তা'আলা আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত ঘোষণা করে যে মহান দায়িত্ব দিয়েছেন (৩ : ১১০ এবং ১০৪ দ্রষ্টব্য), আমরা

তা পালনে সচেষ্ট হতে পারি। আলেম এবং ইমাম যারা কুরআন ও সহীহ হাদীস বহির্ভূত বক্তব্য দেন, তাদের সঠিক বক্তব্য রাখার পরামর্শ দিতে পারি।

সহীহ হাদীস সুন্নত ও নফল ইবাদতে সাহায্য করে, যেহেতু ইসলামের ৫টি ফরয ইবাদত যা হাদীসের ব্যাখা ছাড়া পালন করা সম্ভব ছিল না, তা পালন করার নিয়ম-কানুন আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই আসুন কুরআনের তরজমা অধ্যয়ন করে সঠিক ইবাদতের মাধ্যমে আমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জনে সচেষ্ট হই।

কুরআন বুঝার জন্য সম্পূর্ণ কুরআনের তরজমা একবার অধ্যয়নের পরিবর্তে নিম্নে উল্লিখিত ছোট-বড় মিলিয়ে মাত্র ১২টি সূরা ৩/৪ বার অধ্যয়নই শ্রেয়। আমি মনে করি, এ সূরাগুলো কুরআনের ৩০ শতাংশেরও কম, অথচ এতে ৭০ শতাংশেরও বেশি মুহকাম আয়াত ও দু'আর উল্লেখ আছে।

এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, কেউ এ কথা দ্বারা ভুল বুঝবেন না, কুরআনকে ১২টি সূরা ৩/৪ বার পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ করছি। এর অর্থ হল, যারা সময় পান না, তারা মোটামুটি ১২টি সূরা পাঠ করলে গোটা কুরআনের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবেন। অন্যথায় যারা সম্পূর্ণ কুরআন অর্থ অনুসারে পড়তে পারেন এবং চিন্তা-ভাবনা করে জীবন চলার পাথেয় হিসাবে উপজীব্য সংগ্রহ করতে পারেন, তাদের জন্য সম্পূর্ণ তরজমা পড়াই সর্বোত্তম।

১২টি সূরা হচ্ছে—

২ নং থেকে ৭ নং সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারা থেকে আরাফ

১০ নং সূরা ইউনুস

১৬ নং সূরা নাহল

১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল

২১ নং সূরা আম্বিয়া

২৫ নং সূরা ফুরকান

৩৯ নং সূরা যুমার

কুরআন সহজে বুঝতে হলে প্রথমত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তরজমা পড়তে হবে। সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে, কুরআন আমাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর প্রণয়নকৃত বিধি-বিধান ও উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়। আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো এবং এগুলো অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে জানাই হবে

কুরআনের তরজমা পড়ার মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে তরজমার বইতে উদ্ধৃত তাফসীর (ব্যাখ্যা) বা ফুট নোট পরিহার করে কমপক্ষে ২ বার কেবল তরজমা পড়তে হবে। অন্যথায় কুরআন বুঝার জন্য নিজের বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ থাকবে না। কুরআনের কোনা কোনো আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা, এমনিভাবে সকল সহীহ হাদীসের একটি বিরাট অংশ কুরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "ওরা তোমার নিকট কোনো সমস্যা নিয়ে এলে আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি," (২৫ : ৩৩) যেহেতু "তার বিশদ ব্যাখ্যা করে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" (৭৫ : ১৯)

কুরআনে আলোচিত ঘটনা বা কাহিনীসমূহ সেকালের ইতিহাস। এ সব আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়। (৬৯ : ৪-১২, ৭৯ : ১৫-২৬) এই সকল কাহিনীর বিস্তারিত জানার কিংবা এর অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র বা দলিল নেই।

কোনো সূরা বা আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ব্যতীত কুরআন ও হাদীস বহির্ভূত সকল প্রকার ব্যাখ্যাই মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে প্রদত্ত নিজস্ব অভিমত। তাই এগুলোর আলোচনা ও প্রচার পরিহার জরুরি। কুরআন ও হাদীস বহির্ভূত ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পরিবর্তনশীল, যে সকল আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে বলেছেন, সেগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক। এ সকল আয়াত নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে মানুষ উপকৃত হতে পারে। যে সকল আয়াতে ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে অথবা উপমা দেয়া হয়েছে এবং যে সকল আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় না, সেগুলো মুতাশাবিহ আয়াত (৭ : ৩)। "আল্লাহ একটি উপমা দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে প্রদর্শন করেন সঠিক পথ। মূলতঃ এর দ্বারা অবাধ্য/ফাসিকদের ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না।" (২ : ২৬)

দ্বিতীয়ত, কুরআনের পাঠককে তার মন থেকে কোনো পূর্বপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। নচেৎ পাঠের সময়ে পাঠক রূপক আয়াতগুলোর মাঝে নিজের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত

চিন্তাধারারই প্রতিফলন দেখতে প্রয়াস পাবে এবং অনেক মুহকাম আয়াত তার নজর এড়িয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, অধ্যয়নকালে মুহকাম আয়াত নজরে পড়ামাত্র তা দাগাতে হবে ও নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। কোনো বক্তব্য পরিষ্কার না হলে সেটি নোট করে নিতে হবে। কেননা সামনের দিকে কোথাও না কোথাও এ বক্তব্য পরিষ্কার হবার সম্ভাবনা থাকবে। যেহেতু কুরআন "এমন এক কিতাব যাতে একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে।" (১৭ : ৪১)

এজন্য কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা, কোনো আয়াতের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝে না এলে ঐ বিষয়টিই অন্য কোনো আয়াতে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বার পড়ার সময় আরও কিছু নতুন মুহকাম আয়াত নিশ্চয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে, যা ভিন্ন রঙের কালি দ্বারা দাগাতে হবে। প্রথম বার যে সকল আয়াতের বক্তব্য পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়নি তার অধিকাংশ আশা করি এবার হয়ে যাবে। এভাবে পাঠ করলে আমি নিশ্চিত, আপনি কারও সাহায্য বা ব্যাখ্যা ছাড়াই কুরআন বুঝতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(এ কুরআন) বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশক, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন, যেন এদের বহু দূর থেকে আহ্বান করা হয়।" (৪১ : ৪৪, ২৭ : ৮০-৮১)

রাসূল (সা.) তাঁর স্বজাতি অর্থাৎ আরবী ভাষাভাষীদের উদ্দেশ করে বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তেলাওয়াত করবে, তার একটি নেকী মিলবে এবং প্রত্যেক নেকীর প্রতিফল দশগুণ প্রদান করা হয়। [তিরমিযী, বর্ণনাকারী ইবনে মাসঊদ (রা.)]

রাসূল (সা.) বলেন, "পবিত্র কুরআন শরীফ বুঝে তেলাওয়াতকারীর সওয়াব দশ গুণ বেশি হবে।" না বুঝে তেলাওয়াতকারীর আমলনামায় প্রতিটি অক্ষরে দশটি এবং বুঝে তেলাওয়াতকারীর প্রতিটি অক্ষরে একশ' নেকী লেখা হয়।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে নিম্নে বুঝে ও না-বুঝে কুরআন তিলাওয়াতের মূল্যায়ন করা হলো। না বুঝে খতম দিতে যে সময়ের প্রয়োজন তার মান ধরা হচ্ছে ১। সম্পূর্ণ কুরআনের তরজমা পাঠ এবং পূর্বে উল্লিখিত ১২টি সূরার

তরজমা তিন বার পাঠের মানও ১ করে নেয়া হলো। যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশেই বুঝে তরজমা অধ্যয়ন করতে হবে, তাই এর জন্য দেড় গুণ বেশি সময় ধার্য করা হলো। পরবর্তীতে তিলাওয়াতের সাথে সাথে তরজমা পাঠের জন্য দ্বিগুণ সময় ধরা হয়েছে।

ক্রম	বিবরণ	সময়ের মান	প্রতি অক্ষরে নেকীর পরিমাণ	মন্তব্য
১.	না-বুঝে খতম	১.০	১০	নেকী ছাড়া কোনো ফায়দা নেই।
২.	বুঝার উদ্দেশে ১২টি সূরার তরজমা ৩ বার গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করা	১.৫	মনে করুন কোনো নেকী নেই	কুরআনের মূল বক্তব্য ও বিধি বিধান জানা যাবে।
৩.	সম্পূর্ণ কুরআন বুঝার উদ্দেশ্যে তরজমা পাঠ	১.৫	মনে করুন কোনো নেকী নেই	কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও আদেশ নিষেধ, উপদেশ জানা যাবে।
৪.	২ নং ও ৩ নং অনুশীলনের পর তিলাওয়াতের সাথে সাথে তরজমা পড়া	২.০	১০০	প্রতিটি সূরা ও আয়াতের বক্তব্য বুঝা যাবে, ঈমান শক্ত হবে।
	মোট সময় =	৫		

প্রদত্ত চার্ট পর্যালোচনা করে বলা যায়—

১. কুরআনের বাণী বুঝার জন্য প্রথম বার তরজমাসহ তিলাওয়াত করতে না বুঝে পাঁচ খতমের সমপরিমাণ সময় লাগবে;

২. না-বুঝে পাঁচ বার তিলাওয়াতে প্রতি অক্ষরে ৫০ নেকী, বুঝে তেলাওয়াতে ১০০ নেকী;

৩. পরবর্তীতে কেবল তরজমাসহ তিলাওয়াতে দ্বিগুণ সময় দিয়ে পাওয়া যাবে ১০০ নেকী। একই সময়ে না বুঝে দুই তিলাওয়াতে ২০ নেকী;

৪. তিলাওয়াতকৃত সূরা ও আয়াতের অর্থ বোধগম্য হওয়ার পর শুধু তিলাওয়াতেই না বুঝে তিলাওয়াতের দশ গুণ বেশি নেকী মিলবে।

কুরআনের বিধি-বিধান জানা ও তা মেনে জীবন পরিচালনা করাটা কুরআন নাযিলের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহীহ উচ্চারণে না বুঝে তিলাওয়াত কুরআন নাযিলের পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং না বুঝে তিলাওয়াতের অভ্যাস না করে কুরআনের বক্তব্য জানার উদ্দেশ্যে প্রথমে তরজমা পড়ার অভ্যাস করাটা বুদ্ধিমানের কাজ। যাতে রাসূলকে বলতে না হয়, "হে আল্লাহ, আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআন পরিত্যাগ করেছিল।" (২৫:৩০)

একমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর জ্ঞানই পাঠককে সরল পথে চলতে ও সঠিক ইবাদত করতে সাহায্য করে। আল্লাহ বলেন, "যাদের তাওরাত (ইহুদীদের ধর্মীয় কিতাব) দেয়া হয়েছিল, অথচ তারা তা মান্য করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত কিতাববাহী গাধার মত" (কিতাব বহনকারী গাধা যেমন তার পীঠে কী রয়েছে জানে না এবং তা তার কোনো উপকারে লাগে না, সে শুধু বহন করে)। (৬২ : ৫)

সুধী পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন, কুরআন আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি পঠিতব্য কিতাব, প্রতিনিয়ত কুরআন আবৃতি ছাড়াও আমরা প্রতিদিন কুরআনের আয়াত দিয়ে নামায আদায় করি, দু'আ করি, বিপদে-আপদে, অসুখ-বিসুখে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত কামনা করি। অথচ দুঃখের বিষয় হলেও এটা কি সত্য নয়, আমাদের অধিকাংশই কুরআনের যা পড়ছি, যা আবৃতি করছি তার কিছুই বুঝি না?

আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ বুঝে করে থাকি, কেবল ধর্মীয় কাজ, এর ব্যতিক্রম। যে কোনো পুস্তক পাঠ করে তার বক্তব্য অনুধাবনের চেষ্টা করি, কিন্তু কুরআন মাজীদের বেলায় ব্যতিক্রম। এটা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে না, আমাদের অধিকাংশের জীবনে কুরআনই একমাত্র কিতাব যা আমরা কিতাববাহী গাধার মতই সারা জীবন শুধু না বুঝে প্রতিনিয়ত পড়ে/তিলাওয়াত করে থাকি। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন, "তোমরা নিজেকে কুরআন শরীফ খতমে গণনার দিকে

প্রলুব্ধ করো না। কেননা একটি মাত্র আয়াত বুঝে শুনে পাঠ করা সারা রাত ধরে দুই খতম করার থেকে অনেক উত্তম।" (এহইয়ায়ে উলূমুদ্দিন)

এ পুস্তকে আলোচিত সকল বিষয় সঠিক ও পরিষ্কারভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় আয়াত উল্লেখ করার সাথে সাথে অতিরিক্ত আরও কিছু সূরার আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। এ পুস্তক অধ্যয়নকালীন আয়াতগুলো কুরআন থেকে পাঠ করে নিলে পরবর্তীতে কারও সাহায্য ছাড়াই কুরআন বুঝা সহজ হবে।

প্রকৃত কথা হলো, পবিত্র কুরআন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধির এবং চিন্তা দিয়ে অনুধাবনের বিষয়। নচেৎ কুরআন নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

তাই, নিজেরা কুরআনের তরজমা পড়ে তা বুঝার চেষ্টা করি ও জ্ঞান অর্জন করি এবং আমাদের প্রিয়জনদেরও অনুরূপ করতে বলি। আল্লাহ বলেন, "যারা জ্ঞান রাখে এবং যারা রাখে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে? (৩৯ : ৯)

রাসূল (সা.) বলেন, একজন ইবাদতকারীর ওপর জ্ঞানী ব্যক্তির (কুরআন-হাদীসের) মর্যাদা এতটাই বেশি, যেমন রাতের আকাশে তারার আলোর উপর পূর্ণিমা চাঁদের আলোর মর্যাদা। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীরা তথা আলেমগণ রাসূলেরই উত্তরাধিকারী। রাসূল (সা.) তাদের জন্য দিনার অথবা দিরহাম (অর্থাৎ টাকা-পয়সা) রেখে যাননি। রেখে গেছেন কেবল (কুরআন-হাদীসের) জ্ঞান। তাই যে ব্যক্তি তা অর্জন করবে সে মহাভাগ্যবান। (আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অর্থ বুঝার পর প্রত্যেকে নিজ পছন্দমত আয়াতগুলো মুখস্থ করে তা নামাযে, মুনাজাতে এবং অন্যান্য ইবাদতে আবৃতি করে দশ গুণ বেশি নেকী অর্জন করবেন। অর্থ বুঝে মুখস্থ করলে আপনি আপনার বক্তব্য ও মনোভাব কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে সঠিকরূপে আল্লাহর কাছে সব ইবাদতে পেশ করতে পারবেন এবং নামাযে অধিকতর মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝার ও তাঁর উপদেশগুলো মেনে চলার তৌফিক দিন। কেননা, আল্লাহকে সত্যিকারের ভালবাসার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর বিধি-বিধান জানা ও তা আন্তরিকতার সাথে আমল বা মেনে চলার চেষ্টা করা।

সারমর্ম

কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রণয়নকৃত ও রাসূলের নিকট নাযিলকৃত মানবজীবন বিধান, যার সঠিক বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদাত।

কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এ কুরআন মানুষের জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (২৭ : ৭৭, ৪৫ : ২০)

"এ কুরআন সমগ্র জগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।" (৩৮ : ৮৭, ৬৮ : ৫২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, "এ কুরআন এক কল্যাণময় উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি, তবুও কি তোমরা এটা অস্বীকার করবে।" (২১ : ৫০)

অবশ্য উপদেশ গ্রহণের বা বর্জনের স্বাধীনতা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন, আল্লাহ বলেন, "আমরা তাকে জীবন যাপনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে ইচ্ছা করলে আমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলতে পারে। কিংবা হতে পারে অকৃতজ্ঞ" (৭৬ : ৩)।

কুরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা তিলাওয়াত, ক্বিরআত ও রাতালা শব্দের ব্যবহার করেছেন, যার প্রত্যেকটিরই আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— বুঝে পাঠ করা। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের সহীহ উচ্চারণ ও সুরের জন্য ব্যবহৃত যের, যবর, পেশ, গুন্নাহ, মাদ ইত্যাদির প্রচলন হয় রাসূলের পরের যুগে।

নিজ ভাষায় কুরআন বুঝে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি কোনো রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করিনি, যেন সে তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে।" (১৪ : ৪)

আমাদের রাসূলও (সা.) অনুবাদকের মাধ্যমে অন্যান্য ভাষাভাষীদের কাছে তাদেরই মাতৃভাষায় কুরআনের বাণী পৌঁছে দেন।

রাসূল (সা.) বলেন, "পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারীর সওয়াব না বুঝে আবৃতির চেয়ে দশ গুণ বেশি হবে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তা যারা যথার্থরূপে পড়ে অর্থাৎ বুঝে পড়ে তারাই এতে বিশ্বাস করে। এবং যারা তা করে না (অর্থাৎ বুঝে পাঠ করে না) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (২ : ২১২)

"যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই কুরআন পরিত্যাগ করে।" (৫১ : ৯)

কুরআন বাস্তবায়ন করতে হবে কেবল রাসূল (সা.)-এর তরীকায়। আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.)-এর স্বভাব, চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা বা আয়না স্বরূপ"(মুসলিম)। সুতরাং কুরআনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য রাসূল (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমি সম্মানিত আলেম ও ইমাম সাহেবদেরকে সকল প্রকার ধর্মীয় আলোচনায় শিক্ষিত মুসলমানদেরকে অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের মত কুরআন বুঝে অধ্যয়ন করার উপদেশ দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমান

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণের প্রতি। আজও যাঁরা ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখছেন তাঁদের প্রতি।

সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূল। আর ঈমান যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে সকল ইবাদত আল্লাহর কাছে বাতিল বলে গণ্য হয়। ঈমানের প্রথম কথা হলো এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, সত্যিকার মাবুদ, অন্য কেউ নয়। কেননা, একমাত্র তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা, বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থাপক। তিনি তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং একমাত্র তিনিই তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রতিফল ও অবাধ্য জনকে শাস্তি প্রদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। আল্লাহর রহমত পেতে হলে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়াও তাঁর আদেশ-নিষেধ জানতে ও মানতে হবে, আন্তরিকতার সাথে তা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ কেবল আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। এটাই হচ্ছে ঈমানের সারমর্ম, কিন্তু পরিপূর্ণ ঈমান নয়।

ঈমানের সংজ্ঞা হলো—আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ বলেন, "তোমরা পূর্ব দিকে কি পশ্চিম দিকে মুখ করলে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা, পরকাল ও ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" (২ : ১৭৭)

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, "আমরা একদিন রাসূলে কারীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন সাহাবায়ে কিরামের এক সমাবেশের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন। ইতোমধ্যে এক লোককে সামনের দিক থেকে আসতে দেখা গেলো। তার পোশাক ছিল সাদা ও চুল গভীর কাল রঙের।

তার উপর সফরের কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের মধ্য থেকে কেউই এ নবাগতকে চিনতেন না। লোকটি উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের বৃত্ত অতিক্রম করে অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একেবারে সামনে হাঁটু গেড়ে এমনভাবে বসে গেলো, তার হাঁটু রাসূল (সা.)-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে দিল এবং হস্তদ্বয় রাসূল (সা.)-এর উরুর উপর স্থাপন করল। অতঃপর বলল, হে মুহাম্মদ (সা.), আমাকে বলুন, ইসলাম কী?

রাসূল (সা.) বললেন, **ইসলাম** (অর্থাৎ তার আরকান) হচ্ছে, তুমি (অন্তরে ও মুখে) সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ (অর্থাৎ, ইবাদতের যোগ্য সত্তা) নেই, মুহাম্মদ তাঁর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। এ জওয়াব শুনে নবাগত প্রশ্নকারী বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

এরপর লোকটি আরয করল, এখন আমাকে বলুন **ঈমান** কী?

নবী কারীম (সা.) বললেন, ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাদের, রাসূলদের, কিতাবসমূহ এবং কিয়ামতের দিবসকে সত্য বলে জানবে। প্রত্যেক মঙ্গল-অমঙ্গল তথা তাকদীরও সত্য বলে বিশ্বাস করবে ও মানবে। একথা শুনে সে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

অতঃপর লোকটি আরয করল, এবার বলুন **ইহ্সান** কী?

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইহ্সান হলো, তুমি ইবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করবে যেন তাঁকে (আল্লাহকে) প্রত্যক্ষ করছ। তুমি তাঁকে না দেখলেও (মনে এ ধারণা রাখবে,) তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, এ আলোচনার পর নবাগত লোকটি প্রস্থান করল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, ওমর! জান এ প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ.)। তিনি তোমাদের মজলিস বা বৈঠকে এসেছিলেন, তোমাদের (প্রশ্নোত্তরে) দ্বীন তথা ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদ শিক্ষা দেয়ার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

ঈমান

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। শরীয়াতের পরিভাষায় অন্তরের বিশ্বাসকেই ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালত সত্য বলে জানা। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে মুনাফেকী।

আল্লাহ বলেন, "প্রকৃত মু'মিন হলো তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কেঁপে উঠে, আল্লাহর আয়াতের তিলাওয়াত শুনে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের প্রভুর উপরই নির্ভর করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত মু'মিন।" (৮ : ২-৩)

সকল ইবাদত এবং নেক কাজ কবুলের পূর্বশর্তই হচ্ছে সহীহ ও সঠিক ঈমানের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে (ক্ষমা করে) দিব এবং তাদের নেক কর্মের উৎকৃষ্ট বিনিময় দিব।" (২৯ : ৭, ৪৭ : ২-৩)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।" (৬৪ : ১১)

আমাদের অধিকাংশের ধারণা, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যই হচ্ছে ঈমান। এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা কুরআনের বাণীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের পর তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি কথা, কাজ ও চিন্তা কেবল কুরআন নির্দেশিত ও রাসূল প্রদর্শিত পন্থায় করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, "আনুগত্য ও ঈমান এক জিনিস নয়। শুধু আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হলে কৃতকর্মের ফল কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। কেননা মুমিন (ঈমানদার ব্যক্তি) হচ্ছে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তারপর তাতে আর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি; বরং আল্লাহর প্রণীত জীবনবিধান মেনে চলতে গিয়ে প্রয়োজনে আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ, (অর্থাৎ আল্লাহর প্রণীত জীবনবিধান মেনে চলার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে বদ্ধপরিকর)।" (৪৯ : ১৪-১৫)।

আল্লাহ আরও বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা।" (৯৮ :৭)

হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে জীবন যাপনের পথ এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী ও নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর কাছে ঈমানবিহীন আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ ঈমানের সাথে সাথে শরীয়াতসম্মত আমল করতে হয়। আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং এর ফলে বান্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ১৩০ বারেরও বেশি ঈমান আনার নির্দেশ দেন। ঈমান শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। যেমন, আমরা আযানে বলি—"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং নামাযের প্রতি রাকাতে বলি, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন" (১ : ৪), অর্থাৎ (হে আল্লাহ), আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য চাই। এর সত্যতা কাজের মাধ্যমেও প্রমাণ করতে হবে। আমরা সংসারে যাদের ভয় করি কিংবা শ্রদ্ধা করি, তাদের আদেশ-নিষেধ অন্তত তাদের উপস্থিতিতে মেনে চলার চেষ্টা করি। তেমনি কর্মক্ষেত্রেও জবাবদিহিতার কারণে মনিবের নির্দেশ যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করি।

আমরা আল্লাহতে আমাদের বিশ্বাসের কথা বলি, আল্লাহর কাছে আমাদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে এবং আল্লাহর শাস্তিকে আমরা ভয় করি, কিন্তু বাস্তবে আমরা আল্লাহর বিধি-বিধান জানার বা মানার চেষ্টা করি না। কুরআন হাদীসের জ্ঞানের অভাবে আমরা যে সার্বক্ষণিক আল্লাহর নজরদারীতে আছি তাও উপলব্ধি করি না। আল্লাহ বলেন, "আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সবই আল্লাহর, তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব নেবেন"। (২ : ২৮৪, ৬৭ : ১৩-১৪)

"আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রাখো, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।" (২ : ২৩৩)

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছুই কর আল্লাহ তা অবগত আছেন"। (৫৭ : ৫)

"তোমরা কি বোঝ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাদের মধ্যে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত না থাকেন। পাঁচ জনের মধ্যেও এমন হয় না যেখানে তিনি ষষ্ঠ জন রূপে না থাকেন, সংখ্যায় ওরা এর চেয়ে কম বা বেশি হোক এবং ওরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ ওদের সঙ্গে আছেন।" (৫৮ : ৭)

"আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সব তিনি জানেন, আর তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর বা যা প্রকাশ কর, আর তিনি তো অন্তর্যামী।" (৬৪ : ৪; ৩ : ২৯)

আল্লাহকে ভয় করার অন্যতম কারণ হচ্ছে কিয়ামত, শেষ বিচারের দিন ও তার পরিণতির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। এ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ। যাদের এ বিশ্বাস যত দৃঢ় তাদের ঈমানও তত শক্তিশালী। পরকালের জবাবদিহিতার ভয়াবহতাই তাদের আল্লাহর প্রণয়নকৃত জীবনবিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন।" (৮ : ২৯)

এখানে উল্লেখ্য, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ন্যায় আমাদের অনেকের একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, মুসলমানরা তাদের জন্য নিষিদ্ধকৃত কৃতকর্মের জন্য কিছুদিনের জন্য দোযখের শাস্তি ভোগ করলেও পরে সবাই বেহেশতে যাবে (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ্ : ৮০ ও ৯৪-৯৫ এবং সূরা আলে ইমরান : ২৪)

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ৩৯, ৮১, ১৬১-৬২, ২১৭, ২৫৭ এবং ২৭৫; সূরা আলে ইমরানের ৮৬-৮৮, ১১৬; সূরা নিসার ১৪, ৯৩, ১২১ ও ১৬৮-৬৯ আয়াতগুলোতে এবং অন্যান্য সূরার বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৮ বারের অধিক তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনের জন্য চির জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে মানবজাতিকে বার বার সতর্ক করে দেন। "অবশ্য কেউ সীমালংঘন করার পর তওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার

প্রতি অনুকম্পা করেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৫ : ৩৯, ৩৯ : ৫৩-৫৯)।

একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে সকল প্রকার কবীরা গুনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, সেই কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে। কখনও ভুলবশত বা সঠিক জ্ঞানের অভাবে অথবা পারিপার্শ্বিক কারণে বাধ্য হয়ে করলে সে যথাশীঘ্র সম্ভব তাওবার বিধান মোতাবেক অন্তর থেকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করে। অন্যথায় বুঝতে হবে তার ঈমান দুর্বল। প্রতিনিয়ত মানুষ ভুল করে, ভুলের পরে মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং অনুশোচনা করবে, সে কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না, এটাই একজন প্রকৃত ঈমানদারের লক্ষণ।

আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (৩ : ১০২)

এখানে উল্লেখ্য, ধর্মীয় পরিভাষায় মুসলমান শব্দের অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য বা দাসত্ব করা অর্থাৎ শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা। সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এবং সকল প্রকার ইবাদতের লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার প্রণয়নকৃত জীবন বিধানের মাধ্যমে মানুষকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল করে তোলা। ঈমান ব্যতীত ধর্ম যেমন প্রাণহীন, তেমনি সৎকর্মবিহীন ঈমানও আল্লাহর কাছে মূল্যহীন, শুধুমাত্র গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক ইবাদতে ইসলামে কোন পুণ্য নেই। পুণ্য শুধু আল্লাহতে বিশ্বাস ও সৎ কাজে। এ কথাই কুরআনে সর্বাধিকবার বলা হয়েছে (মোট ১৪০-এর অধিক বার বলা হয়েছে)।

তৃতীয় অধ্যায়
শির্‌ক ও বিদ'আত
শিরক (অংশীদার করা)

শির্‌ক পরিচিতি

আল্লাহর সত্তায়, গুণে, ক্ষমতায় ও তাঁর অধিকারে তাঁকে একক, অদ্বিতীয় ও সাদৃশ্যহীন মনে করা এবং এ বিশ্বাসের উপর অটল থাকাই হচ্ছে ইখলাস বা তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদ, যা সকল ধর্মের মূলভিত্তি এবং ইবাদত কবুলের প্রথম ও পূর্বশর্ত। শির্‌ক হচ্ছে তাওহীদের বিপরীত। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে যে কোনোভাবে অন্য কাউকে বা কিছুকে তার অংশীদার স্থাপন করা। বিশেষ করে কারও অলৌকিক ক্ষমতা আছে অথবা আল্লাহর কাছে তার সুপারিশ করার অধিকার আছে মনে করে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, বিপদে-আপদে বা কল্যাণের আশায় তার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্য কামনা করা, তার নির্দেশ মেনে চলা কিংবা আল্লাহর নিকট সুপারিশের জন্য তাকে উসিলা বা মাধ্যম হিসাবে ধরা ইত্যাদি।

ইসলামের মূল বক্তব্য হচ্ছে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদত করা, কোনো কিছুকে তাঁর শরীক বা অংশীদার না করা। এ দুনিয়াতে যত প্রকার অন্যায়-অপরাধ আছে তার মধ্যে শিরকই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মারাত্মক ও জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ বলেন, "আমি মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য।" (৫১ : ৫৬)

আল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহর সাথে অপর কোনো উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।" (১৭ : ২২)

"তুমি অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহর অংশীদার করো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে।" (২৬ : ২১৩)

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই এবং বিধানও তাঁরই।" (২৮ : ৭০)

"তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যই নেই, আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবই ধ্বংস হবে, হুকুম তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।" (২৮ : ৮৮)

আল্লাহর সাথে বা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও ইবাদত করার অর্থই হচ্ছে শিরক করা, যা অমার্জনীয় অপরাধ। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ মাফ করেন না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন।" (৪ : ৪৮)

"যে কেউ আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন এবং আগুন হবে তার বাসস্থান।" (৫ : ৭২)

মনে রাখতে হবে, সব ধর্মই আল্লাহ/ব্রহ্মা বা God-কে সবকিছুর স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করে। দুর্ভাগ্যবশত হিন্দুরা তাদের ব্রহ্মার পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে, খ্রিস্টান ও ইহুদীরা তাদের God-এর পরিবর্তে তাদের নবী-রাসূলদের God-এর ছেলে হিসেবে সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদত করে এবং বৌদ্ধরা তাদের ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবের উপাসনা করে। অথচ "সব নবী-রাসূল ও ইসলাম প্রচারক আল্লাহরই সৃষ্টি এবং আমাদের মতই মানুষ ছিলেন।" (১৮ : ১১০; ৪১ : ৬)

আল্লাহ বলেন, "আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের আনুগত্য থেকে দূরে থাক।" (১৬ : ৩৬)

(তাগুতের অভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী, দুষ্কৃতির মূলবস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেব-দেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপকরণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহ আরও বলেন, "যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, এরা তাদের আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়।" (২ : ২৫৭)

এটা কি এ নয়, যারা ইবাদতে কুরআন হাদীস বহির্ভূত মিথ্যা বানোয়াট পন্থা অনুসরণ করে, শয়তান তাদের মনকে আস্তে আস্তে কুরআন হাদীসের আলো থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ভ্রান্ত ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদের আল্লাহ ও রাসূলকে (অর্থাৎ কুরআন, সহীহ হাদীস) বাদ দিয়ে অন্যদের উপদেশ গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। (৭ : ৩, ২২ : ৩-৪)

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন এক দল লোক থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, আর এরাই হবে সফলকাম।" (৩ : ১০৪)

আল্লাহ আরও বলেন, "কোনো মানুষের পক্ষে এটা হতে পারে না, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেন, তারপর সে লোকদের বলবে, তোমরা

আল্লাহকে ছেড়ে আমার ইবাদতকারী হও; বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী (এক আল্লাহর ইবাদতকারী) হয়ে যাও। কারণ, তোমরাই কিতাব শিক্ষা দাও ও তোমরাই তা পড় এবং ফেরেশতাদের ও নবীদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দিবে না, তোমাদের মুসলমান হবার পর সে কি তোমাদের কাফের হতে বলবে " (৩ : ৭৯-৮০)।

আল্লাহ নবীকে বলেন, "বলো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে; বলো, আমি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করি না। তা করলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব এবং আমি আর হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল থাকবো না।" (৬ : ৫৬)

ইবাদত বলতে আমরা সাধারণত সালাত/নামায, যিকির, দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বুঝি, যা নাকি আমরা আল্লাহর রহমত বা সাওয়াবের আশায় করে থাকি। কিন্তু ইসলামে ইবাদত বলতে আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য তথা আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ, বিশেষ করে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা এবং আদেশসমূহ পালন করা বুঝায়। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই আলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাঁকে ভয় করতে হবে, কেবল মুখে বিশ্বাস করি বললেই হবে না। আল্লাহ বলেন, "মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, কিন্তু আসলে তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ ও বিশ্বাসীগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, এটা তারা বুঝতেও পারে না।" (২ : ৮-৯)

রাসূলের যুগে মক্কার বিধর্মীরা বা পৌত্তলিকরা জানতো—আল্লাহই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, জীবিকাদাতা ও মালিক, তথাপি তারা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) ছিল না। কেননা তারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেব-দেবী ও কবরপূজা করত। আল্লাহ তাদের কুরআনে কুফফার (অবিশ্বাসী) এবং মুশরিকীন (শিরককারী) বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ কুরআনে রাসূলের ভাষায় বলেন, "বলো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন, অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত থেকে জীবিত বের করেন ও সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে—আল্লাহ ; বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না।" (১০ : ৩১, ৩৯ : ৩৮, ২৩ : ৮৪-৯০)

আল্লাহ আরও বলেন, "তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করে।" (১২ : ১০৬)

ইবাদাতে একমাত্র আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণ (অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা) করাই ঈমান তথা তাওহীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্যই নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর, তিনি সবকিছুরই তত্ত্বাবধায়ক।"। (৬ : ১০২)

আল্লাহ আরও বলেন, "হে মানবজাতি! তোমরা ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের, তবেই তোমরা রক্ষা পেতে পারো।" (২ : ২১, ১০৭)

সুতরাং একমাত্র আল্লাহই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী এবং একমাত্র তিনিই মানুষকে ইবাদতের কল্যাণকর প্রতিদান দিতে পারেন। তাই কুরআন হাদীস বহির্ভূত কোনো আমলে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো পুণ্য নেই; বরং তা কুরআন হাদীস বহির্ভূত বলে আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে তার গযব বা অভিশাপের শিকার হতে পারে।

আমাদের মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, সকল প্রকার ইবাদত এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। অন্যথায় তা শিরক বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, "আর তাদের কেবল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (৯৮ : ৫)

আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পরিগণিত করে এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই নূরের তৈরি ফেরেশতারা মাটির তৈরি মানুষকে আল্লাহর হুকুমে সেজদা করে তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আল্লাহ কাউকে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেননি, যা দিয়ে কেউ নিজের বা অপরের ভাল-মন্দ সাধন করতে পারে বা হিদায়াত করতে পারে অথবা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। নবী ও রাসূলগণকে দিয়ে যখন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অলৌকিক বিষয় আল্লাহই প্রকাশ করিয়েছেন, নবী ও রাসূলগণের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল না। কুরআনে রাসূলের ভাষায় আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপর আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আর আমি যদি অদৃশ্যের (ভবিষ্যতের) খবর জানতাম, তবে তো আমার সবকিছু ভাল হত, মন্দ কিছু আমাকে স্পর্শ করত না।" (৭ : ১৮৮, ৬ : ৫০, ১১ : ৩১)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর বক্তব্য উপলব্ধি না করে যারা নবী/রাসূল ও পীর আউলিয়াদের মু'জিযা ও কেরামতিকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে আখ্যায়িত করে নানা মিথ্যা ও কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে মুসল্লিদেরকে বিপথগামী করে চলছে, তারা নিজেরাই জাহান্নামী। (৩ : ১৮৭-১৮৮)

প্রায় সব মাযারই চালু হয়েছে খাদেম ও অন্ধ ভক্তদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক অলৌকিক কাহিনীর মাধ্যমে। তাছাড়া মাযার বাঁধাই করে (যা রাসূল সা. নিষেধ করেছেন) ও গেলাফে (কাপড়ের চাদরে) ঢেকে তা ভক্তদের কাছে আকর্ষণীয় ও পবিত্র স্থান করে তোলা হয়। সব মাযার প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে শির্ক ও বিদ'আতের মাধ্যমে আয়ের উৎস সৃষ্টি করা। মাযারে যে উদ্দেশ্যে ভক্তরা যায় তা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করার অন্তর্ভুক্ত। যেমন—মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা, তাদের কাছে বিপদ থেকে উদ্ধারের নিমিত্ত আশ্রয় প্রার্থনা করা, দু'আ কবুলের জন্য তাদের উসিলা (মাধ্যম) ধরা, তাদের নামে মানত করা, তাদের অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় শিরনি দেয়া, দান করা ইত্যাদি। (দেখুন ৩৬ : ৭৪, ৩৯ : ৩ এবং ৬৫)

কবরবাসীর কাছে কিছুমাত্র আশা করা শিরকের প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ উদ্দেশ্যে মাযার যিয়ারত বা ওরস উদযাপন হারাম।

আল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরই সৃষ্টি করা হয়, সবাই তোমাদের মত বান্দা। তারা মৃত প্রাণহীন এবং কবে আবার পুনরুত্থিত হবে তাও তারা জানে না।" (১৬ : ২০-২১, আরও দেখুন ২৫ : ৩)

তাছাড়া ভক্তরা সেখানে বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ও কল্যাণের আশায় মিলাদ পড়ায়, যা নাকি বিদ'আত এবং খাদেমদের বাড়তি আয়ের পথ।

সকল প্রকার অলৌকিক ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। যেসব নবী রাসূল অলৌকিক কাজ করেছিলেন, যেমন নিরক্ষর নবীর নিকট বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাযিল হওয়া ও নবীর ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া (৫৪ : ১-৪), মূসা (আ.) কর্তৃক লোহিত সাগরের জলরাশি ভাগ করে সঙ্গী-সাথীসহ পারাপারের রাস্তা বের করা (২৬ : ৬৩), ঈসা (আ.)-এর জন্মের পর দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলা, মৃত মানুষকে জীবিত করা, স্পর্শ দ্বারা কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করা (৫ : ১১০) ইত্যাদি সবই ছিল আল্লাহর তরফ থেকে মু'জিযা, যেন লোকেরা তাঁদের নবী/রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, তাঁদের কথা বিশ্বাস করে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তাঁদের নিজস্ব কোনো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহর

অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়।" (৪০ : ৭৮, ২৯ : ৫০)

তাছাড়া নবী-রাসূল ব্যতীত অতীতে আল্লাহ কাউকে মু'জিযা দিয়েছেন বলে কোনো দলিল নেই। তাই কারো অলৌকিক ক্ষমতা আছে মনে করে তাকে শ্রদ্ধা করা, তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তার নামে মানত করা ইত্যাদি শিরকের প্রথম পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া মানুষ মারা যাবার পর তার সব ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। শিরকের মূল কারণ হচ্ছে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল ধারণা।

আসলে অলৌকিক ক্ষমতা বলতে এমন এক ক্ষমতাকে বুঝায়, যা দ্বারা এমন কাজ সম্পন্ন করা হয় যার প্রক্রিয়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। ভাববার বিষয়, যদি নবী-রাসূল এবং পীর/আউলিয়ার মু'জিযার নিজস্ব ক্ষমতা থাকতো, তবে আপদে-বিপদে তাদের নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। (৯ : ৪০, ২১ : ৮৩-৮৪ এবং ৮৭-৯০ দ্রষ্টব্য)

প্রয়োজনে ভক্তরা তাদের অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্য কামনা করলে তা নিশ্চয়ই শিরক বলে গণ্য হতো না।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমানই কুরআনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং মাওযু ও যঈফ হাদীসের প্রভাবে ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের মুশরিকদের মত নবী-রাসূল, অলি-আউলিয়া, পীর-দরবেশদের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তির মাধ্যমে নানা প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা ইসলামের মূলবক্তব্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "ইয়্যা-কা না'বুদু, ওয় ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন" বাক্য দুটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল, ধর্মের মূলমন্ত্র তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা ভ্রান্ত ধারণা। নিম্নে উল্লিখিত আয়াতগুলোর বক্তব্য এ সম্পর্কিত অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে সহায়ক হবে। আয়াতগুলো হচ্ছে—২ : ১০৭, ৬ : ১৬২-১৬৪, ৭ : ১৯১-১৯৪, ১৮ : ১০২, ১১০, ২৮ : ৭০, ৮৮, ৩৫ : ২-৩, ৪২ : ৯।

আজকের মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণা পূর্ববর্তী মুশরিকদের মধ্যেও হুবহু বিদ্যমান ছিলো। তাদের কথা ছিলো-

"আমরা তো এগুলোর ইবাদত করি, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দেবে।" (৩৯ : ৩)

এবং "তারা বলে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী"। (১০ : ১৮)

আল্লাহ বলেন, "তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের সুপারিশকারী ধরেছে? বলো, তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা কোন কিছু না বুঝলেও কি তাদের সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করবে? বলো, সকল সুপারিশ আল্লাহর এখতিয়ারে এবং আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।" (৩৯ : ৪৩-৪৪)

আশা করি শ্রদ্ধেয় পাঠকরা এ পুস্তকে পূর্বে উদ্ধৃত ১২টি সূরার তরজমা অধ্যয়নকালে শির্ক এবং নবী-রাসূল সম্পর্কিত আয়াতগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে সেগুলোর বক্তব্য বুঝার চেষ্টা করবেন। কেননা, কেউ শির্কে লিপ্ত অবস্থায় মারা গেলে কোনো নবী-রাসূলও তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবেন না। রাসূল (সা.) তাঁর নিজের চাচা (আবু তালিব)-র জন্য (৯ : ১১৩), নূহ (আ.) তাঁর ছেলে (কিনান)-র জন্য (১১ : ৪৫-৪৭) এবং ইবরাহিম (আ.) তাঁর পিতা (আযর)-র জন্যও (৯ : ১১৪) মাগফিরাত চাইতে পারেননি।

আল্লাহ বলেন, "আত্মীয়-স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সংগত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তারা জাহান্নামী।" (৯ : ১১৩)

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ শিরক করলে তাদেরও সব আমল বিনষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, "আর তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যাকিছু করত সবই নিষ্ফল হতো।" (৬ : ৮৮, ১৭ : ৩৯)

আল্লাহ আরও বলেন, "তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী (রাসূলদের) প্রতি এ ওহীই করা হয়েছে, তুমি যদি আল্লাহর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করো, তবে তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (৩৯ : ৬৫)

অর্থাৎ নবী/রাসূলগণ যদি মানুষদের ধারণা দিতেন, তাদের নিজস্ব অলৌকিক ক্ষমতা আছে তবে তা নিশ্চয়ই শিরক বলে গণ্য হতো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনের বোধশক্তি দান করুন, এ হোক আমাদের কামনা।

আমীন !

বিদ'আত

(নব আবিষ্কৃত আমল/ধর্মে নতুন সংযোজন)

বিদ'আত হচ্ছে শরী'আতের (দীন ইসলামের) মধ্যে এমন সব নতুন উদ্ভাবিত আকীদা ও আমল, যা নেকীর উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা পালন করে থাকেন, অথচ সে আকীদা ও আমল কুরআন এবং নির্ভুল হাদীস স্বীকার করে না। মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবী বা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এর প্রচলনও ছিল না।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ (সা.) বলেন, "যে লোক এমন আমল করল, আমার উপস্থাপিত শরীয়ত যার অনুকূলে ও সমর্থনে নয়, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (মুসলিম)

আল্লাহ বলেন, "হে মুসলমানগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমতির আগে তোমরা (শরীয়তের কোনো বিষয়ে) অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাশ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" (৪৯ : ১)

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রগামী হয়ো না" কথার অর্থ– শরীয়ত (কুরআন ও নির্ভুল হাদীস) যে বিধান দেয়নি তার অনুসরণ করো না। রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবী ও চার খলিফার যুগে শরীয়তে যা ঈমান, আকীদা ও আমল ছিল তাই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তব শরীয়ত। পরবর্তী যুগে আমলের নামে শরীয়তে যা ঢুকেছে এবং যেসব আকীদা বা আমলের পক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীস সমর্থিত শরীয়তের কোনো দলিল নেই, তাই হচ্ছে বিদ'আত বা পথভ্রষ্টতা।

আল্লাহ বলেন, রাসূল (সা.) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাক (৫৯ : ৭)।

এখানে গ্রহণ ও বর্জনে ইসলামী শরী'আতের সীমা দিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ওয়ালা বা আশেকে রাসূল হতে হবে এরই মধ্য থেকে। এর বাইরে গিয়ে দীনের মধ্যে সংযোজিত সকল প্রকার আমল, তা যত যুক্তিসঙ্গত বা ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শন বহনকারী হউক না কেন, তা নিশ্চয়ই বিদ'আত ও বর্জনীয়।

বিদ'আত আমল চিহ্নিত করার সহজ উপায় হচ্ছে, এটা নিশ্চিত হওয়া যে, আমলটির প্রচলন খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে হয়েছে, অথবা সাহাবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচারিত বক্তব্যটি সহীহ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। এ অধ্যায়ে বিদ'আত বলে আলোচিত সকল প্রকার আমলের প্রচলন হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে।

জানা ও বুঝার পরেও বিদআতি আমল করার অর্থ হচ্ছে—

১. যিনি বিদ'আতি আমল প্রচলন করেছেন তাকে নবীর কথার উপর মর্যাদা দেওয়া, অর্থাৎ নবীর চেয়েও বড় ব্যক্তিত্ব মনে করা;
২. নবীর আদেশ নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা;
৩. রাসূলের যুগে দ্বীন অসম্পূর্ণ ছিল মনে করা; যেহেতু রাসূল (সা.) এসব ফযিলতের আমল প্রচার করেননি;
৪. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা;
৫. "আজ তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম" (৫ : ৩)— মহান আল্লাহর এ বাণী অস্বীকার করা এবং কুরআনে প্রদত্ত ব্যাখ্যা বা তাফসীর অসম্পূর্ণ মনে করে অন্যান্য তাফসীরের উপর নির্ভর করা। (২৫ : ৩৩)

অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহ যেসব কাহিনী/ঘটনা উপমা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসে রাসূল (সা.) আল্লাহর তরফ থেকে প্রয়োজনীয় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অসুম্পূর্ণ মনে করে অন্যদের মিথ্যা, বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।

আল্লাহ বলেন, "তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তুমি কেবল তারই অনুসরণ করো, তাঁকে ছাড়া অন্য ওলীদের অনুসরণ করো না, অবশ্য তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।" (৭ : ৩)

আল্লাহ কুরআনে আরো বলেন, "(হে নবী) বলো : হে আহলে কিতাব, তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমরা এমন লোকদের মনগড়া বিষয়ের অনুসরণ করো না, যারা ইতোপূর্বে নিজেরা হয়েছে বিপথগামী আর অনেক মানুষকেও করেছে পথভ্রষ্ট। আসলে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চলে গেছে।" (৫ : ৭৭)

কুরআনের অজ্ঞতা হেতু আমাদের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং রাসূলের উপদেশ বাণী পরিত্যাগ করে কতিপয় স্বার্থপর ও বিপথগামী আলেম, ইমাম, ভণ্ডপীর এবং আউলিয়াদের নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী ভ্রান্ত আমলে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হচ্ছে। তাই কারো বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবনের চেষ্টা করুন। (৭ : ১৭৯)

বিদ'আতপন্থীদের শরীয়তের দলিল হচ্ছে—

১. দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীর বানানো হাদীস;

২. তথাকথিত আলেম-ওলামার প্রচারিত নীতি, আমল ও মতের শর্তহীন অনুসরণ;
৩. মুরব্বী ও ইমাম এবং পীর সাহেবদের কথা, যার পক্ষে কুরআন-হাদীসের কোনো সমর্থন নেই।

অন্যদিকে মুমিনদের শরীয়তের দলিল হচ্ছে—(১) কুরআন মজীদ, (২) নির্ভুল হাদীস ও (৩) উলিল আমরের শর্তসাপেক্ষ অনুসরণ।

অর্থাৎ নির্দেশটি কেবল পূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ-অনুকরণের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার (সিদ্ধান্তের) অধিকারী। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, এটাই উত্তম ও কল্যাণকর।" (৪ : ৫৯)

দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাশীল কিছু আলেম ও ইমাম সাহেব আছেন যারা সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিদ'আত আমলে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, জানা বুঝা সত্ত্বেও তা চালু রাখতে তারা সচেষ্ট। এতে তাদের গুণগ্রাহীদের সব আমলই বিনষ্ট হচ্ছে এবং ইসলামের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, পার্থিব স্বার্থের লোভে তারা তা উপলব্ধি করতেও চান না।

আমাদের সমাজের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী। মিলাদের প্রচলন শুরু করে কতিপয় স্বার্থপর আলেম (ধর্মীয় দৃষ্টিতে যালিম)। রাসূল (সা.)-এর অন্তর্ধানের প্রায় পাঁচশ' বছর পর এবং এদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন আরম্ভ হয় মাত্র গত শতকের শেষের দিকে। অথচ এ দুটি বিদ'আত আমল আমাদের সমাজে শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আল্লাহর প্রশংসা বা গুণগানের পরিবর্তে ভক্তরা রাসূলের প্রশংসায় লিখিত নানা ভাষার কবিতা সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে গাইতে পছন্দ করেন। এতে মনে হয় যেন তারা আল্লাহর পরিবর্তে রাসূলকে খুশি করতেই বেশি আগ্রহী। (২ : ১৬৫ ও ৩ : ৭৯-৮০ নং আয়াতে দ্রষ্টব্য)

এসব করা হচ্ছে রাসূলের ভালবাসার নামে। অথচ রাসূল (সা.) যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা কি তাকে ভালবাসার লক্ষণ? রাসূল (সা.) বলেন, "আমার প্রশংসায় তোমরা বাড়াবাড়ি করো না যেমনটা ইহুদিরা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে করেছে। আমি তো একজন

দাসমাত্র। তাই বলো, আল্লাহর দাস ও তার রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম, এছাড়াও দেখুন— আল-কুরআন, ৫ : ১১৬-১১৭)

রাসূল (সা.) নিষেধ করার কারণে রাসূল পরিবারের সদস্যরা, তাঁর সাহাবীরা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনরা রাসূলের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন থেকে বিরত থেকেছেন। নিঃসন্দেহে রাসূলের প্রতি তাদের ভালবাসা পরের যুগের আলেমদের থেকে অধিক ছিল। এটা সহজে বলা যায়, মিলাদ এবং মিলাদুন্নবীর প্রচলন না হলে ওরস বা বিভিন্ন বার্ষিকী উদযাপনের সুযোগ থাকতো না। এ অনুষ্ঠান যারা পরিচালনা করেন, তারা বিদ'আত জেনেও কেবল পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য তা করে থাকেন এবং যারা তাতে অংশগ্রহণ করেন তারা এটাকে বিরাট সাওয়াবের কাজ ও ধর্মীয় কাজ বলে মনে করেন। অথচ রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যার উপর আমার কোনো আদেশ বা সমর্থন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)।

রাসূল (সা.)-এর গুণগান গাওয়া, তাঁর প্রশংসায় কবিতা পড়া, সবাই মিলে সালাম পাঠ করা নিশ্চয়ই বিদ'আত নয়, কিন্তু একে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ইবাদতে পরিণত করা বিদ'আত। অর্থাৎ স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসায় মানবরচিত গুণগানকে সাওয়াবের আশায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করা নিশ্চয়ই শিরক ও বিদ'আত।

ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে কুলখানি, চল্লিশা অনুষ্ঠান হিন্দুদের অনুকরণ, যা একমাত্র এ উপমহাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশে আজও চালু হয়নি। মৃত্যুবার্ষিকীকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করাও এ অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া জামাতে ফরয নামাযের পর সবাইকে নিয়ে মুনাজাত করাটাও এ উপমহাদেশের ইমামদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাসূল (সা.) তাঁর নবুওয়তের দীর্ঘ ২৩ বছরে শেষ কয়েকদিন ব্যতীত সকল ফরয নামাযের ইমামত করেন, অথচ নামায শেষে সবাইকে নিয়ে মুনাজাত করেছেন বলে কোনো দলিল নেই। সুতরাং জামাতে ফরয নামাযের শেষে সবাইকে নিয়ে ইমাম সাহেবদের মোনাজাত না করাটাই সুন্নত এবং করাটা নিশ্চয়ই বিদ'আত। তবে জামাতে সুন্নত নামাযের পর, যেমন রমযান মাসের বেতের নামায শেষে এরূপ মুনাজাত করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

এখানে উল্লেখ্য, আমি অনেক আলেম ও ইমাম সাহেবদের মিলাদ অনুষ্ঠান, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন, কুলখানি, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন এবং জামাতে ফরয

নামাযের শেষে ইমাম সাহেবদের মুনাজাত ইত্যাদি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈধ কিনা জানতে চাইলে সবাই এগুলো বিদ'আত বলে স্বীকার করেন। কথাটার সত্যতা আপনাদের মসজিদের ইমাম ও পরিচিত আলেমদের জিজ্ঞাসা করে যাচাই করতে পারেন। কেননা, নিশ্চয়ই কেউই সহীহ দলিল দেখিয়ে এগুলোর বৈধতা প্রমাণ করতে পারবেন না।

নামাযের প্রারম্ভে আমরা সাধারণত যে নিয়্যত পড়ে থাকি তাও বিদ'আত। নিয়্যত মুখে বলার বিষয় নয়, এর সম্পর্ক মনের সাথে। রাসূল (সা.), তাঁর সাহাবী এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে মুখে নিয়্যত করার কোনো দলিল নেই। মাযহাবের চার ইমামও মুখে নিয়্যত করার কথা বলেননি কিংবা কোনো প্রকার নিয়্যত শিক্ষাও দেননি। দাঁড়িয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে হাত বাঁধাটাই সুন্নত।

১৫ই শাবান দিবাগত রাত বা শবে বরাত-এর জন্য নির্দিষ্ট করে কোনো নামায নেই। একমাত্র শবে কদর ও রোযার মাসের তারাবীহ ব্যতীত অন্য কোনো রাতের জন্যই নির্দিষ্ট করে কোনো নামায নেই। রাসূল (সা.) প্রতি রাতের মত এ রাতেও নিজ বাসগৃহে তাহাজ্জুদ ও নফল নামায আদায় করতেন। অবশ্য বরকতময় রাত বলে অতিরিক্ত নফল নামায আদায় করেছেন ও একাকী কবর যিয়ারত করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। সাহাবীগণ অতিরিক্ত নফল ছাড়া এ রাতে অন্য কোনো নামায পড়েননি কিংবা মসজিদে এশা ব্যতিরেকে কোনো জামাত করেননি। সওয়াবের আশায় নতুন কোনো নামায আবিষ্কার, হালুয়া-রুটি পরিবেশন, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি করা ধর্মের নামে বিদ'আত।

আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি বিদ'আত হচ্ছে ২৭ শে রমযানের রাতকে শবে কদর ধার্য করে তা পালন করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাসূলের পরবর্তীতে সমাজে আলেম বলে স্বীকৃত কারও ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে রাসূলের কথার উপর প্রাধান্য দিয়ে আমরা এটা করে থাকি। আয়েশা (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন, রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তোমরা শবে কদর সন্ধান কর।" (বুখারী)

অথচ যিনি এটা চালু করেছেন, তার বক্তব্য হচ্ছে, সূরা কদরে আল্লাহ এই রাতকে চিহ্নিত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরবী ভাষায় "লাইলাতুল কদর" নয়টি অক্ষরের সমষ্টি এবং এটা ৩ বার এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ ৯ কে ৩ দিয়ে গুণ করলেই ২৭ পাওয়া যায়। এ বক্তব্যের অর্থ কি এ নয়, আল্লাহ

তা'আলা রাসূলের কাছে এ তথ্য প্রকাশ করেননি এবং তাঁর সাহাবীরাও সূরা কদর থেকে তা বের করতে পারেননি। বক্তব্যটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা পাঠকগণ নিজেরাই বিবেচনা করবেন।

যেহেতু কদরের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযিলতের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনেই ঘোষণা করেছেন, তাই এ মহান রাতকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে চিহ্নিত না করে রাসূলের উপদেশ অনুযায়ী ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের যে কোনো একটি রাতই শবে কদর হতে পারে বিবেচনা করে এ পাঁচটি রাতকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে যথাসম্ভব বেশি বেশি ইবাদত করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

যারা এ সকল বিদ'আত আমল পরিচালনা করেন তারা বলেন, এ সব সমাজে এতটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এখন বন্ধ করার উপক্রম করলে ফিতনার সৃষ্টি হবে। তাদের এ যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তা পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করবেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর দীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়।" (৮ : ৩৯)

শিরক ও বিদ'আত আমলের বিরুদ্ধে কথা বলা যদি ফিতনা হয়, তাহলে রাসূলগণই কি সবচেয়ে বড় ফেতনা করেছেন? কোনো বিদ'আত আমল পরিচালনা না করে বরং মুসল্লিদের তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয়াই কি সবার কর্তব্য নয়? যেহেতু অজ্ঞতা ছাড়া নিশ্চয়ই জেনে বুঝে কেউ বিদ'আত আমলে অংশগ্রহণ করেন না।

আমাদের অনেকের ধারণা, হজ্জ বা ওমরা করতে গিয়ে প্রথমে রাসূল (সা.)-এর রওযা মোবারক যিয়ারত করা শ্রেয়। ধারণাটা সঠিক নয়। এটা ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ।

অনেকে বিশ্বাস করেন, মসজিদে নববীতে এক নাগাড়ে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে রাসূল (সা.) তাকে বেহেশতে নেওয়ার জিম্মাদার হবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কথাটা অবশ্যই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। রাসূল (সা.) বলেন "যে আমার নামে মিথ্যা বলবে সে অবশ্যই জাহান্নামী।" (বুখারী, মুসলিম)

সত্য জানার পর যারা কুরআন হাদীসের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে পূর্বের ভুল শিক্ষার অন্ধ অনুসরণ করে, তাদের যুক্তি হচ্ছে—বিদ'আতে হাসানা অর্থাৎ উত্তম বিদ'আতের উপর আমল করা জায়েজ। তাদের যুক্তির অর্থ কি এ নয়, রাসূলের পরবর্তীতে সমাজে স্বীকৃত আলেমরা ভাল মনে করে অথবা

লোকদের ইবাদতে প্রলুব্ধ করার লক্ষ্যে তাদের ইচ্ছামত নতুন নতুন আমল চালু করতে পারেন এবং বিভিন্ন সূরা বা আয়াতের ফযিলত বলতে পারে, যা কুরআন বা হাদীসে বলা হয়নি। রাসূল (সা.) বলেন, দীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে, কেননা প্রতিটি সংযোজন বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী। (তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের বাণীতেও রাসূল (সা.) একমাত্র কুরআন ও হাদীসকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, যেহেতু এর বহির্ভূত সকল প্রকার আমলই পথভ্রষ্টতা।

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন, পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থ বিকৃতির প্রধান কারণই হচ্ছে বিদআতের প্রচলন, যা নাকি মানুষকে কুরআন ও হাদীসের বাণী থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দিয়ে শির্‌কে লিপ্ত করে এবং মূল উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করে।

রাসূলের পরের যুগের আলেম-বুযুর্গদের স্বরচিত-দরূদে লাখি, দরূদে তাজ, দরূদে হাযারী, দরূদে মাহী, দরূদে নারিয়া, দরূদে সাইফুল্লাহ্, দরুদে খাজেগান ইত্যাদি সকল দরূদই বিদ'আত। সহীহ হাদীসে কেবল রাসূলের শেখানো দরূদ—দরূদে ইবরাহীমের উল্লেখ আছে, যা আমরা প্রতি নামাযেই সালাম ফেরাবার পূর্বে পাঠ করে থাকি।

এ উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত উপরে বর্ণিত বিদ'আত আমলগুলোর মূল উৎস হচ্ছে—মাওযু অর্থাৎ মনগড়া বা মিথ্যা বানানো হাদীস এবং যঈফ বা দুর্বল হাদীস।

আমাদের সমাজে বহুল প্রচারিত হাদীস গ্রন্থগুলো যেমন মুসনাদে আহমদ, মেশকাত শরীফ, বাইহাকী ও দারিমী প্রভৃতির সংকলনকারীগণ কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই সব হাদীস গ্রহণ করেছেন। হাদীসবিশারদদের মতে এগুলোতে মওযু ও যঈফ হাদীসের সংমিশ্রণ রয়েছে।

এ জাতীয় গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্যে যে সকল হাদীস, হাদীস বিশারদগণের নিকট সর্বসম্মত সহীহ হাদীস হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি তা পরিহার করা জরুরি। মাওযু ও যঈফ হাদীস থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে হাদীস বিশারদদের দ্বারা স্বীকৃত হাদীস গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ এবং এ সকল হাদীস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখিত কিতাব সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। ইসলাম সম্পর্কিত সকল প্রকার বক্তব্য ও আলোচনা কুরআন এবং সহীহ হাদীসের মধ্যে

রাখা উচিত। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। এ সকল সত্য উপলব্ধি করতে পারলে পাঠকগণ শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমল করতে সক্ষম হবেন।

অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ করলে যেমন মুহকাম আয়াত সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা হয়, তেমনি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পর হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে কিংবা হাদীস শুনলে তা সহীহ হতে পারে কিনা অনুমান করা যায়। হাদীসটি নিশ্চয়ই সহীহ নয় যদি তা হয়—

১। কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থী।

২। শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট নীতির বিপরীত।

৩। নবীগণের শিক্ষার বিরূপ।

৪। আমলটির প্রচলন হয় খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে।

আদেশ-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, কিচ্ছা-কাহিনী বা ইবাদত-বন্দেগীতে আকর্ষণের জন্য বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ইসলামী শরীয়তের যে কোনো ক্ষেত্রে বা যে কোনো বিষয়ের উপরই যঈফ বা মাওযু হাদীস বর্ণনা বা হাদীস জাল করা সম্পূর্ণ হারাম। এ সম্পর্কে রাসূলের একটি কঠোর সতর্কবাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করে তার স্থান অবশ্যই জাহান্নাম।" (মুসলিম)

আমাদের সমাজের যারা জেনে বুঝে যেকোনো উদ্দেশেই হোক, সহীহ হাদীস ব্যতীত বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য রাখেন অথবা কিতাব লেখেন, তারা কি ইচ্ছাপূর্বক রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করার ঝুঁকি নিচ্ছেন না এবং শ্রোতা পাঠকবৃন্দকে তা নিতে উৎসাহিত করছেন না? আশা করি এ কথার গুরুত্ব সবাই একটু ভেবে দেখবেন।

আমলের উপর যুগে যুগে নানা ভাষায় শত শত বই প্রকাশিত হয়েছে, যার বেশির ভাগই কুরআন হাদীস বহির্ভূত উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। এ সবের উৎস হয় তো লক্ষ লক্ষ জাল বা মাওযু হাদীস, অথবা লেখকের নিজস্ব মতবাদ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তা সর্বকাজে প্রয়োগ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সব প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায় না।" (৮ : ২২)

দুঃখের বিষয়, আমরা এ দুনিয়ার সব কাজে নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করি, কিন্তু একমাত্র কুরআন হাদীসের বক্তব্যের ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম বা উদাসীন। তাই আসুন, ইবাদতের ব্যাপারে কারো উপদেশ গ্রহণ করার পূর্বে তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত কি না, তা জানার চেষ্টা করি।

হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ। সুন্নত আমল হচ্ছে কুরআন বহির্ভুত অতিরিক্ত আমল যা রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা করে গেছেন ও করতে বলেছেন। একমাত্র কুরআনের জ্ঞানই হাদীসের বক্তব্যের যৌক্তিকতা ও সঠিকতা নির্ণয়ে সহায়ক, যা শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমলের জন্য অপরিহার্য। কেননা পরবর্তীতে মানুষকে ইবাদতে প্রলুব্ধ করার জন্য সামান্য আমলে অধিক সাওয়াবের লোভ দেখিয়ে মাওযু ও যঈফ হাদীসের মাধ্যমে নানা প্রকার বিদ'আত আমলের প্রচলন হতে থাকে। এক কথায় বলা যায়, বিদ'আত আমল হচ্ছে বিষমিশ্রিত লোভনীয় সুস্বাদু খাবার। তাই সাবধান, হাদীসের বক্তব্য নিয়ে আলোচনার সময় সূরা ইমরানের ৭ নং আয়াত যে নির্দেশনা দিয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ আমলের জন্য যেসব বক্তব্য অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক সেগুলো ব্যতীত অন্যগুলোর আলোচনা এবং অনুশীলন পরিহার করতে হবে।

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন, মাওযু ও যঈফ হাদীসের প্রভাবে সমাজে নানা প্রকার বিদ'আত আমল শিকড় গেড়ে বসেছে। বিদ'আত আমল বর্জন এবং অন্যদের এ থেকে বারণ করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সবাইকে করতে দেখে কুরআন হাদীস (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ) বহির্ভূত আমল না করার জন্য আল্লাহ রাসূলকেও (সা.) সাবধান করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে ও মনগড়া কথা বলে।" (৬ : ১১৬)

যারা রাসূলকে (সা.) ভালোবাসে তারা সত্য জানার পর বাতিলপন্থীদের অনুকরণ-অনুসরণ না করে একমাত্র রাসূলের নির্দেশিত পথেই আমল করে থাকে। রাসূল (সা.) যা করেননি কিংবা করতে বলেননি এবং তাঁর সাহাবীরাও যা করেননি তা তারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।

তারা যুক্তিতর্ক, খেয়ালখুশি, ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমাজে প্রচলিত নানা প্রকার বিদ'আত আমল দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল (সা.) থেকে যা প্রমাণিত, তারা কেবল সে অনুযায়ী আমল করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা

একমাত্র রাসূলের মাধ্যমে নিয়ামত পূর্ণ করেছেন, দীনকে পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা করেছেন। অতএব একমাত্র তাঁর শরীয়তই হচ্ছে প্রকৃত শরীয়ত, যাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ, অন্য সবই বিদ'আত।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) আদেশ-উপদেশ অমান্য করে শিরক ও বিদআতি আমলে লিপ্ত হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করবে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হবে।" (৩৩ : ৩৬)

আল্লাহ আরও বলেন : "যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দোযখে দাখিল করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে।" (৪ : ১৪)

পরিশিষ্ট

আল্লাহ বলেন, "কোনো ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারী যদি নেক কাজ করে তবে সে জান্নাতবাসী হবে এবং তার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।" (৪ : ১২৪)

"কেউ যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তবে তিনি তাকে দাখিল করাবেন জান্নাতে।" (৬৫ : ১১)

বেহেশতে যাওয়ার সহজ তরিকাই হচ্ছে ঈমান আনা ও সৎকাজ করা। আল্লাহ বলেন, "যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে এবং বলবে, তোমরা ভীত হয়ো না তোমাদের জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।" (৪১ : ৩০)

সকল ধর্মেই ঈমানবিহীন সৎকার্য ও সৎকার্যবিহীন ঈমানের কোনো মূল্য নেই। আর ঈমানের অর্থই হচ্ছে সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর অসীম শক্তির উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনে আমি তাদের অভিভাবক, আমি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসি।" (২ : ২৫৭)

এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীর সকল ধর্মের বিকৃতি ঘটেছে বড় বড় ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় নেতা বা তথাকথিত আলেমদের দ্বারা। এটা সত্যি, আজ আমাদের সমাজেও বেশ কিছু আলেম ওলামা রয়েছেন, বেশভূষায় ও কথাবার্তায় যাদের দ্বীনি ব্যক্তিত্ব মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা কুরআন-হাদীস বহির্ভূত নিজেদের বা

পীর-মুরশিদদের অথবা মাওযু ও যঈফ হাদীসের মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা শ্রেয় মনে করে এবং সাধারণ মুসলমানদের ভ্রষ্টপথে পরিচালিত করে। (৩১ : ৬) অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মত আজ আমরা নানা প্রকার ভ্রান্ত আকীদায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহর গজবের শিকার হচ্ছি। শিরক ও বিদ'আত আমলের প্রচলন হওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টজীব বা বস্তুর ক্ষমতা ও মর্যাদার মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়নে আমাদের চরম ব্যর্থতা। নবী-রাসূল ও পীর-আওলিয়াদের নিয়ে রচিত নানা কল্পিত ও অতিরঞ্জিত অলৌকিক কিচ্ছা কাহিনী শ্রোতাদের মনে তাঁদের প্রতি অতিভক্তির সৃষ্টি করে। পরিণতিতে তারা বিপদমুক্ত ও উপকৃত হওয়ার আশায় স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে সৃষ্টির শরণাপন্ন হয়। (২২ : ১২-১৩) অথচ কুরআনে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া ভাষায় রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই।" (১০ : ৪৯)

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং সবকিছুর কর্মবিধায়ক।" (৩৯ : ৬২, ৫ : ১২০)

"আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যখনই কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেন তখন তার সম্পর্কে বলেন হও, তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়।" (২ : ১১৭)

তিনি কোটি কোটি তারা, অর্থাৎ সূর্য সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সূর্য এরই একটি ক্ষুদ্রতম তারা। পৃথিবী এ সূর্যেরই একটি নগণ্যতম গ্রহ মাত্র। তাই পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্ট কোনো জীব বা বস্তুকে স্রষ্টার অলৌকিক ক্ষমতার সাথে তুলনা করে স্রষ্টার মতই ভয়, শ্রদ্ধা বা সম্মান করা, ভালোবাসা ইত্যাদি মূর্খতা ও অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ বলেন, "আর কোনো কোনো লোক আছে যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদের আল্লাহর মতই ভালোবাসে, কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছে তারা আল্লাহর ভালোবাসায় সুদৃঢ়।" (২ : ১৬৫)

আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় কোনো নবী-রাসূল বা পীর-আওলিয়ার শরণাপন্ন না হয়ে বরং কুরআনের শিক্ষা ও হাদীসে বর্ণিত পন্থায় একমাত্র আল্লাহর শরণাপন্ন হতে হবে। আল্লাহ বলেন, "যারা বলে আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ এবং তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (৪৬ : ১৩)

আল্লাহ আরও বলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই নিরাপত্তা, শান্তি এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (৬ : ৮২)

আল্লাহ তা'আলা শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলকেও (সা.) সতর্ক করেছেন। দেখুন-আল কুরআনের আয়াত ২৬ : ২১৩ এবং ৩৯ : ৬৪-৬৬।

সকল নবী-রাসূল আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কিত কুরআনের সূরা ও আয়াত— ২ : ১৫১, ৫ : ৭৫, ২৬ : ১০৬-১০৭, ১২৪-১২৫, ১৪২-১৪৩, ১৬১-১৬২, ১৭৭-১৭৮ দ্রষ্টব্য। আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁদের বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং নবুয়তের দায়িত্ব অর্থাৎ আল্লাহর বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেন। আল্লাহ আল-কুরআনে রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি বলো, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, তোমাদের উপাস্য (আল্লাহ) একমাত্র উপাস্য, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (১৮ : ১১০)

আল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা কি এজন্য বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে?" (৭ : ৬৯, ২৩ : ৩২-৩৪ এবং ৪৭)

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের যুগের মানুষগণ তাদেরই মত একজন মানুষকে নবী-রাসূল হিসেবে মানতে অস্বীকার করে। (১০ : ২) কেননা যার নিজের (৭ : ১৮৮) বা অপরের (৭২ : ২০-২৩) ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা নেই, এমনকি হিদায়াত করারও ক্ষমতা নেই (২৮ : ৫৬), তিনি রাসূল হবেন কী করে? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, "যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে, তখন তারা বলে, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাদের এ উক্তি তাদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে।" (১৭ : ৯৪)

পরবর্তীতে তথাকথিত আলেম, সাধারণ মানুষের মনে অতিভক্তি ও কৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে নবী-রাসূলদের নামে অতিরঞ্জিত, বানোয়াট, মিথ্যা ও কল্পিত অলৌকিক কাহিনী প্রচার আরম্ভ করে। যার অধিকাংশেরই ভিত্তি মাওযু, যঈফ ও জাল হাদীস। অথচ নবীদের সঙ্গীরা বিশ্বাস করত, আল্লাহই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নবীরা নয়। (২ : ৬০-৬১, ২৬০, ৩ : ৪৯, ৫ : ১১০-১১৫, ৮ : ১৭ এবং ২০ : ১৭-২৩ দ্রষ্টব্য)

মানুষ যাতে ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের মত রাসূলের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে এবং রাসূল (সা.)-এর আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা না থাকে, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ এক আল্লাহ।" (৪১ : ৬)।

আল্লাহ বলেন, "রাসূলের উপর প্রচার করা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব নেই।" (৫ : ৯৯)

এ বাণী প্রচারের সারমর্ম হচ্ছে, "তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই, বিধানও তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।" (২৮ : ৭০)

রাসূল (সা.) বলেন, "তিনিই (আল্লাহ) আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।" (১৩ : ৩০)

রাসূল (সা.) আরো বলেন, "আমি তোমাদের বলি না আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। আর অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি জানি না, আমি তোমাদের এও বলি না, আমি ফেরেশতা, আমার প্রতি যা নাযিল হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" (৬ : ৫০)

কোনো নবী ও রাসূলই আল্লাহর বাণী ব্যতীত নিজস্ব কোনো বক্তব্য প্রচার করেননি। ইবাদত একমাত্র নবীদের দ্বারা প্রচারিত আল্লাহর বাণীর অনুসরণ এবং নবীর অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোনো প্রকার সংশয়যুক্ত বা বিতর্কিত আমলের বৈধতা কুরআন অথবা সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা পরিহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ ও বিদ'আত থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি, ধর্ম বলতে একমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত বিধিবিধানকেই বুঝায়। আমল বা ইবাদত হচ্ছে তা পালন করা। ইসলাম হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)-এর তরিকায় অর্থাৎ একমাত্র হাদীসে বর্ণিত পন্থায় তা বাস্তবায়ন করা এবং মুসলমান হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সে ব্যক্তি, যে

শির্‌কমুক্ত ইবাদত করে এবং একমাত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করে, অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে, (৬ : ১৬১-১৬৩ আয়াত দ্রষ্টব্য) এজন্য যে, "আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা তো অসত্য এবং আল্লাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, সুমহান।" (২২ : ৬২, আরও দেখুন ১০ : ৫৫-৫৬)

সকলের উচিত অন্যের বক্তব্য বা উপদেশ অনুযায়ী আমল করার পূর্বে কুরআন-হাদীস থেকে সত্য জানার চেষ্টা করা। রাসূল (সা.) যে আমলের অনুমতি দেননি সে আমল করার নির্দেশ বা উপদেশ যে কোনো ব্যক্তিই দিক না কেন, তা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা, রাসূল (সা.) স্বয়ং নবী হয়েও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ধর্মীয় কোনো বক্তব্য দেননি। কুরআনে রাসূল বলেন, "আমার নিকট ওহী মারফত যা নাযিল হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" (৬ : ৫০, ৭ : ২০৩, ১০ : ১৫ এবং ৪৬ : ৯)

আল্লাহ বলেন, "সে (রাসূল) নিজের ইচ্ছামত কোনো কথা বলে না, সে যা বলে। তা সবই আল্লাহর ওহী" (৫৩ : ৩-৪)। ইচ্ছামত মনগড়া কথা বলার পরিণাম সম্পর্কে দেখুন আল কুরআনের আয়াত—৬৯ : ৪৪-৪৭।

উপরিউক্ত আয়াত দুটি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, কুরআন এবং হাদীসের সকল বক্তব্য আল্লাহর ওহী এবং এর বহির্ভূত ধর্মীয় বক্তব্য ও আমল শয়তানের ওহী। আল্লাহ বলেন, "তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের ওলী বানিয়ে নিয়েছে এবং ধারণা করছে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (৭ : ৩০, আরও দেখুন আয়াত ১৬ : ৯৯-১০০ এবং ১৯ : ৮৩)

তাই আসুন, অন্যদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে এবং কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে আমরা একমাত্র কুরআন হাদীসের যুক্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক আমল করি। অন্যথায় আমাদের সব আমল ব্যর্থ হবে। কুরআন হাদীস বহির্ভূত আমল যারা করেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাসূলকে উদ্দেশ করে বলেন, "তুমি বলে দাও, আমি কি তোমাদের এমন লোকদের পরিচয় দেব না, যারা আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত, তারা ওইসব লোক—দুনিয়ার জীবনে যাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা সৎকাজ করছে।" (১৮ : ১০৩-১০৪, ৪৩ : ৩৬-৩৭)

পাঠকের অবগতির জন্য আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু জনপ্রিয় শির্‌ক ও বিদ'আত আমল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(এগুলো পরিহার তথা পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, দেখুন ৬ : ১১৬)

আমল	সূত্র
১. কল্যাণের আশায় মাযারের নামে মানত করা, মাযারে দান করা, মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।	৭ : ১৯১-১৯৪; ১১: ২-৪; ১৬ : ২০-২২, ৫২-৫৪; ২৫ : ৩, ১৭-১৮; ৩৩ : ১৭
২. ওরসে শরীক হওয়া	ঐ
৩. লোক দেখানো ইবাদত বা রিয়া	১০৭ : ৪-৬
৪. তাবিজ তুমারের কল্যাণে বিশ্বাস করা	রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন
৫. নবীরা গায়েব জানতেন এবং ওলি-আউলিয়ারা গায়েব জানে মনে করে তাদের সাহায্য কামনা করা	৬ : ৫০; ৭ : ১৮৮; ১১ : ৩১
৬. নবীদের মু'জিযার নিজস্ব ক্ষমতা এবং ওলি আওলিয়াদের অলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা	ঐ
৭. নবীর শাফায়াত ছাড়া কেউই বেহেশতে যাবে না বিধায় বেশি বেশি করে নবীর শাফায়াত কামনা করা এবং এ বিশ্বাস করা যে, নবী (সা.) তার নিজ ক্ষমতায় আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই শাফাআত করতে সক্ষম।	২ : ৪৮, ১০৭, ১২৩, ১৮৬; ৬ : ৫১, ৭০; ৩৯ : ৪৩-৪৪ এবং ৭২ : ২০-২৩
৮. নবী নূরের তৈরি, তাঁকেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয় ইত্যাদি বক্তব্য সঠিক বলে গ্রহণ করা	হাদীস বহির্ভূত ছকের পরে বি.দ্র. দেখুন
৯. মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা	কুরআন ও সহীহ হাদীস বহির্ভূত

১০. শবে বরাত পালন করা	ঐ
১১. কুলখানি, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা	ঐ
১২. রাসূলের পরবর্তীতে প্রচলিত বিদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত দু'আ দরূদের আমল করা	ঐ
১৩. নামাযে নিয়ত পাঠ করা	ঐ
১৪. দরূদে ইবরাহীমের চেয়ে উত্তম মনে করে অন্যান্য দরূদসমূহের আমল করা	ঐ
১৫. ফরয নামায শেষে মুসল্লিদের নিয়ে ইমাম সাহেবের মুনাজাত	ঐ
১৬. কেবলমাত্র ২৭ শে রমযানকে শবে কদর সাব্যস্ত করা ও পালন করা	ঐ

উপরে উল্লেখিত ১৬ বিষয়ের যে কোনটির বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে যাতে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে তার জন্য আমি সমাজের আলেম ও ইমাম সাহেব এবং পীর-আউলিয়াদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখিতভাবে ভুল সংশোধন করিয়ে দিয়ে আমজাদ হোসনে আরা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হাদিয়া সংগ্রহের অনুরোধ করছি। সমাজ থেকে শির্‌কি ও বিদআতি আমল উচ্ছেদ করে সঠিক দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমার এই প্রচেষ্টা এবং এই হাদিয়া ঘোষণার উদ্দেশ্য। আজ মুসলিম বিশ্বের বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে—শির্‌কি ও বিদ'আতি আমলের অনুশীলন এবং আল্লাহর নাযিলকৃত জীবন-বিধান অমান্য করার অশুভ পরিণাম।

সত্য উপলব্ধি করার পর সংশ্লিষ্ট সকলের ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে অতীতের ভুলের জন্য অন্তর থেকে তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করা (৬৬ : ৮), পরবর্তীতে নিজ জীবনে কুরআন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া এবং সঠিক ধর্মীয় বাণী প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্যোগ নিয়ে ইসলামের হেফাজতে অংশগ্রহণ করা। (১০ : ১০৪-১০৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রাসূল (সা.) আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন (১৮ : ১১০, ৪১ : ৬) এবং আমাদের মতোই মৃত্যুবরণ করেন (৩ : ১৪৪, ২১ : ৩৪, ৩৯ : ৩০)।

রাসূলকে (সা.) নিয়ে রচিত সকল প্রকার কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনী ও বক্তব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি

করা, অথচ রাসূলের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে আমাদের কর্তব্য শুধু রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শ জেনে-বুঝে তার নিঃশর্ত অনুসরণের চেষ্টা করা, সেটাই হবে রাসূলকে প্রকৃত ভালোবাসা। রাসূলের সুন্নত বা আদর্শ বাদ দিয়ে মাউযু ও যঈফ হাদীসের উদ্ধৃতি দ্বারা নানা কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে রাসূলের প্রতি মিথ্যা ভালোবাসা সৃষ্টি করার প্রয়াস একজন আলেমের জন্য সঙ্গত নয়। আশা করি, পাঠকবৃন্দ নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর রহমতে এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। (৭ : ১৭৮-১৭৯ দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ বলেন, "যে কেউ ঈমান আনবে ও নিজেকে সংশোধন করবে তার কোনো ভয় নেই এবং সে চিন্তিতও হবে না।" (৬ : ৪৮)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমল করার তৌফিক দিন।

সারমর্ম

"শিরককারীদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের কোনো সম্পর্ক নেই।" (৯ : ৩)। আল্লাহ শিরকের গুনাহ কখনও ক্ষমা করবেন না। (৪ : ৪৮, ৪ : ১১৬)

আল্লাহর একক অলৌকিক ক্ষমতার উপর যারা পরিপূর্ণ আস্থা রাখে, তারা শির্‌কমুক্ত ইবাদত করে এবং কুরআনের বিধি-বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনায় সচেষ্ট থাকে।

শির্‌ক ও বিদ'আতি আমল করার প্রধান কারণ—আল্লাহ ও তার সৃষ্টজীবের মধ্যকার ক্ষমতা ও মর্যাদার মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যর্থতা। আশা করি নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর বক্তব্য এ ব্যর্থতা দূরীকরণে সহায়ক হবে।

দেখুন আয়াত— ২ : ১৬৫, ৭ : ১৯১-১৯৩, ১৬ : ১৭-২১ এবং ৭৩-৭৪, ৩০ : ৪০, ৭ : ১৮৮, ১৮ : ১০২ ও ১১০।

বিদ'আতিদের কোনো আমল কবুল হবে না। যে মিথ্যা হাদীস প্রচার করবে, অর্থাৎ রাসূলের নামে মিথ্যা বলবে সে অবশ্যই জাহান্নামী।

বিদ'আত আমল কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়। রাসূলকে (সা.) যারা সত্যিকারভাবে ভালোবাসে তারা বিদ'আত আমল পরিহার করে এবং আলেম-ইমাম, পীর-আউলিয়া ও পূর্বপুরুষদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে। (৯ : ৩১, ৩১ : ২১, ৪৩ : ২২ দ্রষ্টব্য)। বিপদগামী হওয়ার ভয়ে (দেখুন আয়াত ৬ : ১১৬) তারা সমাজের অধিকাংশ মানুষের শরীক হওয়া আমলে অংশগ্রহণের পূর্বে তার বৈধতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

তাদের মনে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কোন আমলের বৈধতা নিয়ে সংশয় বা সন্দেহ হলে তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তার সত্যতা যাচাই বাছাই করে সত্য গ্রহণ করে।

তাদের আমল শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও যারা দ্বিধাগ্রস্থ আছে এবং পূর্বের ন্যায় শির্ক ও বিদআ'তি আমলে লিপ্ত থাকে বা তাতে অংশ গ্রহন করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, " তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না" (২ : ১৮)। আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেন, "তুমি কাউকে প্রিয় মনে করলে তাকে হিদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন, যেহেতু তিনিই ভালো জানেন কারা সৎ পথের অনুসারী" (২৮ : ৫৬)।

এখানে উল্লেখ্য যে, যারা জেনে-বুঝে কুরআনের বক্তব্য গোপন করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাদের অভিসম্পাত করে থাকে" (২ : ১৫৯, ১৭৪)।

যারা শির্ক ও বিদআতি আমল প্রচার কিংবা পরিচালনা দ্বারা মানুষকে ভ্রান্ত ইবাদতে লিপ্ত করে, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীরা তাদের অভিসম্পাত দিবে। তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা আমাদের নেতা ও মুরব্বিদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। আমাদের প্রভু তুমি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং গুরুতর অভিসম্পাত করো।" (৩৩ : ৬৭-৬৮)

আল্লাহ বলেন, "তবে যারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয় আর যা গোপন করে আসছিল তা প্রচার-প্রকাশ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করি। আর আমি তো পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (২ : ১৬০)।

আল্লাহ আরো বলেন, "যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পূণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণ আল্লাহর অভিমুখী হয়।" (২৫ : ৭০-৭১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে শির্ক ও বিদ'আতি আমল শনাক্ত করে শির্ক ও বিদ'আতমুক্ত আমল করতে সাহায্য করুন।

চতুর্থ অধ্যায়
কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন

এখানে উল্লেখিত বান্দাহর কোন কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা কোন আয়াত নাযিল করেছেন তা পরিষ্কারভাবে কুরআন বা হাদীসে কোথাও বর্ণিত হয়নি। এ অধ্যায়টি আমার নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন।

বান্দা বলে
- সকল তারিফ (প্রশংসা) আল্লাহর যিনি সারা জাহানের মালিক,
- পরম দয়ালু ও অতি মেহেরবান।
- যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক।
- (হে আল্লাহ) আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, আর একমাত্র আপনারই কাছে সাহায্য চাই।
- আমাদের সরল সোজা পথে পরিচালিত করুন।
- সেসব লোকের পথে যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।
- তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গজব পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ : ১-৭)

আল্লাহ বলেন
- "(এই নাও আল-কুরআন) এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ; যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে ও তার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এবং আখেরাতে যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে; তারাই প্রকৃত হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলকাম।" (২ : ২-৫)
- "এ কিতাবের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন (যেমন– করণীয় ও বর্জনীয় বা উপদেশমূলক), যা হলো কুরআনের মূল অংশ বা জননীস্বরূপ (মুহকামাত), আর অন্যগুলো হলো রূপক (মুতাশাবিহাত), যাদের অন্তরে বক্রতা বা কুটিলতা আছে, কেবল তারাই ফিতনা সৃষ্টি এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসন্ধান করে।" (৩ : ৭)

বান্দা বলে - "(হে আল্লাহ) আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" (২০ : ১১৪)

- "হে আমার রব, আমাকে হেকমত দান করুন এবং নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (২৬ : ৮৩)

আল্লাহ বলেন - "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের সাথে আছি।" (২ : ১৫৩)

- "যারা ঈমান আনে ও আমাকে ভয় করে, আমি তাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য করার শক্তি দেব, তাদের গুনাহ মাফ করব এবং তাদের ক্ষমা করব।" (৮ : ২৯)

- "যারা ঈমান আনে আমি তাদের অভিভাবক, আমি তাদের অন্ধকার (শিরক) থেকে আলোতে (ইসলামে) নিয়ে আসি এবং যারা শয়তান (তাগুত)-এর অনুসারী, শয়তান তাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায় এবং তারাই চির জাহান্নামী।" (২ : ২৫৭)

- "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে, তারপর ঈমান আনে না।" (৮ : ৫৫)

- যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই, তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে।" (১৬ : ৯৯-১০০)

বান্দা বলে - "হে আল্লাহ, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি আপনার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।" (২৩ : ৯৭-৯৮)

- "(হে আল্লাহ!) যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদের অপরাধী করবেন না। আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তেমন গুরুদায়িত্ব চাপাবেন না যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন।" (২ : ২৮৬)

- "হে আমাদের প্রতিপালক, সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না, আমাদের উপর করুণা করুন, কারণ আপনি মহান দাতা।" (৩ : ৮)

আল্লাহ বলেন - "আমি অবশ্যই তার জন্য ক্ষমাশীল যে অনুতাপ করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।" (২০ : ৮২)

- "যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।"

- "তাদের পুরস্কার আমার কাছে আছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (২ : ২৭৭)

বান্দা বলে - "হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক, আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন।" (১৮ : ১০)

- "আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের গুনাহ মাফ করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (৩ : ১৬)

আল্লাহ বলেন - "আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে সবই আমার, তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আমি তার হিসাব নেব, অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব অথবা শাস্তি দেব।" (২ : ২৮৪)

- "তোমরা যদি কবীরা গোনাহসমূহ পরিহার করে চলো, যে কাজগুলো করতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোটখাটো সব গোনাহখাতা মুছে দেবো এবং তোমাদের দাখিল করবো অতীব সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় (জান্নাতে)।" (৪ : ৩১, ৫৩ : ৩২)

- "আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি এবং তোমাদের যা দিয়েছি তা পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি।" (৬ : ১৬৫)

- "(মনে রেখো) ধন, ঐশ্বর্য, সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, সৎকর্ম যার ফল স্থায়ী, তা আমার নিকট পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশার দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট।" (১৮ : ৪৬)

বান্দা বলে - "হে আসমান জমিনের স্রষ্টা, আপনি এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে আমার অভিভাবক, তাই আমাকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দিন ও নেক বান্দাদের (সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের) অন্তর্ভুক্ত করুন।" (১২ : ১০১)

আল্লাহ বলেন - "তোমরা আমারই ইবাদত কর এবং ইবাদতে কোনো কিছুকেই আমার অংশী করবে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের ভৃত্য, দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ করবে।" (৪ : ৩৬-৩৭)

- "অবশ্য কেউ যদি মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে ও পরে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে সে আমাকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।" (৪ : ১১০)
- "(তবে মনে রেখো) আমি শির্ক (ইবাদতে অংশী) করার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করব না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করি; যে আমার সাথে কাউকে শরীক করে সে এক মহা অমার্জনীয় অপরাধ করে।" (৪ : ৪৮)

বান্দা বলে - "আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি সবকিছুর প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।" (২৩ : ১১৬)

- "আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশে, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি।" (৬ : ১৬২-১৬৩)
- "আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করেন। রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন। আর আমি আশা করি কিয়ামতের দিন তিনি আমার দোষগুলো মাফ করে দিবেন।" (২৬ : ৭৮-৮২)

- "হে আমার রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।" (৭ : ২৩)
- আপনি তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো উত্তম ক্ষমাশীল। অতএব আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় ও পরকালে কল্যাণ লিখে দিন, আমরা আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।" (৭ : ১৫৫-১৫৬)
- "আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন আমি তার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং আপনার পছন্দের সৎকাজ করতে পারি।" (২৭ : ১৯)

আল্লাহ বলেন - "হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন, তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আযাব আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে চল এবং আত্মসমর্পণ কর, অন্যথায় কোনো সাহায্য পাবে না।" (৩৯ : ৫৩-৫৪)

- "এবং সে দিনের ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারো কোনো সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং কেউ কোনো রকম সাহায্যও পাবে না।" (২ : ৪৮; ২ : ১২৩)
- "আরো ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোনো উপকারে আসবে না তার পিতার, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের ধোঁকা না দেয় এবং শয়তানও যেন কিছুতেই তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।" (৩১ : ৩৩)
- "যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে ও সত্বর তাওবা করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করি এবং তাদের ক্ষমা করি।" (৪ : ১৭)

- "কেউ সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে, তার উপর কোনো জুলুম করা হবে না।" (৬ : ১৬০)
- "কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে (কিয়ামতের দিন) তাকে তা দেখানো হবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাকে তাও দেখানো হবে।" (৯৯ : ৭-৮)

বান্দা বলে

- "হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি– তোমাদের রবের উপর ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে রব, আমাদের গুনাহ মাফ করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদের নেককারদের সাথে মৃত্যু দিন।" (৩ : ১৯৩)
- "হে রব, আমাদের ইহকালে কল্যাণ দিন এবং পরকালেও কল্যাণ দিন এবং আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (২ : ২০১)
- "হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবেন সেখানে সদ্ভাবে নিয়ে যান আর যেখান থেকেই বের করবেন সদ্ভাবে বের করুন এবং আমাকে আপনার কাছ থেকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।" (১৭ : ৮০)
- "হে রব, আমাকে মাফ করুন এবং আমার উপর রহম করুন, কেননা আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।" (২৩ : ১১৮)
- "হে রব, (আমার পিতা-মাতা) ছোট বেলায় যেভাবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন আপনিও সেভাবে তাঁদের উপর দয়া করুন।" (১৭ : ২৪)
- "হে রব, হিসাব গ্রহণের দিন আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনদের ক্ষমা করুন।" (১৪ : ৪১)
- "হে রব, আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন, আপনি তো বিজ্ঞ শ্রোতা, আর আমাদের তাওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী ও দয়ালু।" (২ : ১২৭-১২৮)

- "হে রব, আপনার রাসূলের মাধ্যমে আমাদের যা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন তা আমাদের দিন, আর কিয়ামতের দিন আমাদের হেয় করবেন না, নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।" (৩ : ১৯৪)

দয়ালু ও দয়াময় আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যা দেয়ার কথা বলেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

- যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল।
- তাদের চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না, যেহেতু তাদের জন্য আছে চিরস্থায়ী বেহেশত (সর্বাধিক আয়াত রয়েছে)।
- তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে। (২১ : ১০৫, ২৪ : ৫৫)
- যারা কবীরা গুনাহ পরিহার করে চলবে, তাদের ছোট-খাটো গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (৪ : ৩১, ৫২ : ৩২)
- কেউ একটি ভাল কাজ করলে তাকে তার ১০ (দশ) গুণ প্রতিফল দেয়া হবে। (৬ : ১৬০)
- আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে তা ৭০০ (সাতশত) বা তার অধিক গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। (২ : ২৬১)
- ভুল করার পর সত্যিকারের অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নিজেকে সংশোধন করলে অতীতের গুনাহ মাফ করা হবে। (অসংখ্য আয়াতের মধ্যে ৩৯ : ৫৩-৫৮, ২ : ১৬০, ৪ : ১১০, ৫ : ৩৯ এবং ২৫ : ৭০ উল্লেখযোগ্য)

আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ উপরোক্ত আয়াতগুলোর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে সচেষ্ট হবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুন্নত ও নফল ইবাদত

তাহিয়্যাতুল অযু

অযু করার পর দু'রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা.)-কে বললেন, "হে বিলাল, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সবচাইতে বেশি আশাপ্রদ যে আমলটি করেছো সে সম্পর্কে আমাকে বল। কারণ, জান্নাতে আমার আগে আগে আমি তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনেছি।

বিলাল (রা.) বলেন, "আমার কাছে এর চাইতে বেশি আশাপ্রদ আর কোনো আমল নেই যে, যখনই আমি তাহারাত (অযু, গোসল বা তায়াম্মুম) অর্জন করেছি, রাত-দিনের যে কোনো অংশে, তখনই সেই তাহারাতের সাহায্যে আমি নামায পড়েছি, যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায না পড়ে বসা ঠিক নয়।

রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ ফরযের পূর্ববর্তী সুন্নত নামাযসমূহ ঘরে পড়ে মসজিদে জামাআতে ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশে এসে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার পরে জামাআতের অপেক্ষায় বসতেন।

আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দুই রাকআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায পড়ার পূর্বে না বসে।" (মুসলিম)

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। (মুসলিম)

দৈনন্দিন যিকির

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা। (তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদু লিল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং একশ' বার পূর্ণ করার জন্য একবার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর' পড়ে, তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমান হয়।" ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' বার বলবে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর,' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সব রাজত্ব তাঁর, সব প্রশংসা তাঁর, তিনি সব বস্তুর উপর শক্তিশালী—সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লাভ করবে, আর তার নামে লেখা হবে একশ'টি নেকী এবং তার নাম থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে শয়তানের (আছর বা ওয়াসওয়াসা) থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চেয়ে ভালো আমল আনতে পারবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার চেয়ে বেশি আমল করেছে।" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়বে, তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা (সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে) সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন দুটি বাক্য আছে যা মুখে উচ্চারণে হালকা (সহজে উচ্চারিত হয়), কিন্তু (ওজনে) ভারি এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়, তা হচ্ছে—"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।" (বুখারী ও মুসলিম)

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি গুপ্তধনের কথা জানাবো না? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তা হলো– "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার কাছে 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার' বলা দুনিয়ার সব জিনিসের চেয়ে বেশি প্রিয়।" (মুসলিম)

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম তখন 'আল্লাহু আকবর' বলতাম, আর যখন নীচের দিকে নামতাম তখন বলতাম 'সুবহানাল্লাহ'।" (বুখারী)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধিক সংখ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন : "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি" (আল্লাহ পবিত্র, সব প্রশংসা তাঁর জন্য, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তাওবা করি)। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বান্দা যখন সিজদায় থাকে তখন তার রবের সবচাইতে বেশি নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা (সিজদায়) বেশি করে দু'আ কর।" (মুসলিম)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) নিজের রুকু ও সিজদার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি করে পড়তেন। "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি" (হে আল্লাহ, তুমি পাক-পবিত্র, আমাদের প্রতিপালক এবং সকল প্রশংসা তোমারই, আমাকে মাফ করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

ষষ্ঠ অধ্যায়
দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। (৪০ : ৬০, ২ : ১৮৬)

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী আরাফাতের বা হজ্জের দিন ও প্রতি রমযান মাসে কোটি কোটি মুসলমান সারা দুনিয়ায় এবং বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ রোযাদার মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্‌সা অর্থাৎ মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থানসমূহে প্যালেস্টাইনের মুক্তি এবং মুসলিম উম্মাহর সুখ শান্তি ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল ফরিয়াদ করেন। অথচ এ দু'আ যে কবুল হচ্ছে না তা বর্তমানে বিশ্বের মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়।

একদা বসরা শহরের লোকেরা ইরাকের তৎকালীন বিখ্যাত সাধক ইবরাহীম বিন আদহামকে দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, তোমাদের অন্তর ১০টি কারণে মৃত্যুবরণ করেছে, তাই তোমাদের দু'আ কবুল হচ্ছে না। কারণগুলো হচ্ছে—

১. তোমরা আল্লাহকে জান অথচ তাঁর হক পুরোপুরি আদায় কর না;
২. তোমরা কুরআন শরীফ পাঠ কর অথচ তার গুরুত্ব অনুধাবন কর না;
৩. তোমরা রাসূল (সা.) কে ভালোবাস, অথচ তাঁর সুন্নত ছেড়ে দাও;
৪. তোমরা শয়তানকে শত্রু হিসেবে জান অথচ তার পদাঙ্কই অনুসরণ কর;
৫. তোমরা বেহেশতে যেতে চাও অথচ বেহেশতে যাওয়ার আমল কর না;
৬. তোমরা দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পেতে চাও, অথচ তোমরা আগুনের মধ্যেই রয়েছ;
৭. তোমরা মৃত্যু সত্য বলে জান অথচ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না;
৮. তোমরা অন্যের দোষ প্রচার কর অথচ নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য কর না;
৯. তোমরা আল্লাহর দেওয়া রিযিক খাও, অথচ তাঁর শুকরিয়া আদায় কর না;
১০. তোমরা মৃত মানুষকে দাফন কর অথচ তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না।

রাসূল (সা.) দু'আ কবুলের জন্য ২টি পূর্বশর্তের উল্লেখ করেন।

১. শির্‌ক ও বিদ'আতমুক্ত আমল।
২. হালাল রুজী।

রাসূল (সা.) বলেন, "কোন বান্দা হারাম উপার্জন থেকে দান খয়রাত করলে তা কবুল হবে না এবং এ উপার্জনে কোন বরকতও নেই। আর ওই সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে তা তাদের জন্য দোযখের পুঁজি হবে।" বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আরও বলেন, সুদের আয় অবশ্যই একটি হারাম উপার্জন।

হারাম উপার্জনকারীরা শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুনিয়ার জৌলুস ও চাকচিক্যময় জীবন নিয়ে মশগুল থাকে। পরকালের জবাবদিহিতা সম্পর্কে তারা উদাসীন। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তাদের কাছে অর্থহীন। (৬ : ৩২, ১৮: ৪৬, ২৮ : ৬০ এবং ১০২ : ১-৪) তাদের ইবাদত লৌকিকতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং তারা শির্ক ও বিদআতি আমলে অভ্যস্ত।

যে সমাজের কাছে কেবল হালাল রোযগার গ্রহণীয়, সে সমাজে সব অন্যায়ের অন্ততঃ শতকরা নব্বই ভাগ হ্রাস পেতে বাধ্য। কারণ একটি সমাজের অন্যায় অবিচারের মূল উৎস হচ্ছে হারাম রোযগার। এ রোযগার করতে গিয়েই মানুষ লিপ্ত হচ্ছে সুদী কারবার, ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, জুলুম, ভেজালসহ অনেক খারাপ কাজে। ক্রেতাকে নানাভাবে ঠকানো, অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ইত্যাদি নানা ধরনের অবৈধ কাজ।

যারা দেশ ও জাতির ভবিষৎ নিয়ে চিন্তিত এবং নিজের ও সন্তানদের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, আশা করি তারা কেবল হালাল উপার্জনেই সচেষ্ট হবেন। একটি সুশীল ও সুষম সমাজ গড়ার লক্ষ্যে হারাম রোজগারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা জিহাদ। আসুন আমরা এই জিহাদে অংশ নেই।

আশা করি, পাঠক কুরআনের তরজমা অধ্যয়নের পর শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমলের সাহায্যে এবং কুরআনের আদেশ-উপদেশ যথাসম্ভব বাস্তবায়নের মাধ্যমেও দু'আ কবুল না হওয়ার উপরোক্ত কারণগুলো নিজ জীবন থেকে দূর করে দু'আ কবুলের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ধরণা দিবেন। তাই এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি না।

উপসংহার

কুরআন ঈমান ও সৎকর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আল কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে মাত্র দুটো ভাগে ভাগ করেছে। একটি বিশ্বাসী মানুষ, অপরটি অবিশ্বাসী মানুষ। ধর্মে ঈমানবিহীন সৎকাজ ও সৎকাজবিহীন ঈমানের মূল্য নেই। ঈমান ধর্মের প্রাণ এবং সৎকর্ম তার দেহস্বরূপ। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি ধরা যায় না। ইসলামের মূল দাবি, অর্থাৎ কুরআন নাযিলের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর দাসত্বকারী ও সৎকর্মপরায়ণ করে তোলা।

কুরআনের এ মূল দাবি থেকে সরে যাওয়ায় আজ মুসলিম দেশগুলোতে বিপর্যয় নেমে এসেছে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী সত্য কথা ও হালাল রুযি ব্যতীত কোনো মানুষের মানবিক উন্নতি সম্ভব নয়। রাসূল (সা.) বলেন, হালাল রুযি ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত।

হারাম রোযগার আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে হালাল রুযি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। সুদ (২ : ২৭৫ দ্রষ্টব্য), ঘুষ, দুর্নীতি এখন আর তেমন দূষণীয় নয়; বরং এটা এখন সমাজে নানা অজুহাতে ন্যায্য উপরি পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে রাজনীতি, প্রশাসন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে (দেখুন আয়াত ১১ : ১৫-১৬, ২৮ : ৬০, ২৯ : ৬৪ এবং সূরা তাকাসুর)। দেশ ও সমাজের সর্বস্তর থেকে মানুষের সৎচিন্তা, সদিচ্ছা ও সৎকাজের আগ্রহ ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, অন্যায় অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে অমানুষে পরিণত হচ্ছে। জাহিলিয়াত যুগে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ হওয়া মুসলমানেরা আবার জাহিলিয়াতের যুগে ফিরে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বর্তমান মুসলমানদের, বিশেষ করে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় এর অন্যতম কারণ। ধর্ম হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের রক্ষাকবচ। অথচ আজ অধিকাংশ ধর্মীয় বক্তারা কুরআন হাদীস বহির্ভূত কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে ধর্মকে খেল-তামাশায় পরিণত করে চলছে। তারা এর কঠোর পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন। (দেখুন, কুরআনের আয়াত, ৬ : ৭০ ও ২ : ১৫৯)

তাদের অনেকেই দুনিয়ার স্বার্থের লোভে শ্রোতাবৃন্দকে খুশি করার লক্ষ্যে কুরআনের বক্তব্যের পরিবর্তে যঈফ ও মাওযু হাদীসের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে হারাম রুযির কুফল ও পরকালে এর পরিণাম

সম্পর্কে মুসল্লিদের সতর্ক করার পরিবর্তে নানাবিধ বিদআতি আমলের মাধ্যমে অতি সহজে বেহেশতে যাবার মিথ্যা আশা দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদের অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে উৎসাহিত করে যাচ্ছে।

সুধী পাঠক, এ পুস্তকে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে শিরক ও বিদ'আত আমল এবং তার পরিণতি সম্পর্কিত বক্তব্যের সঠিকতা নিয়ে অনেকে নিশ্চয়ই সন্দিহান ও দ্বিধাগ্রস্ত আছেন। এটাই স্বাভাবিক, যেহেতু যুগ যুগ ধরে এগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। (২ : ১৭০, ৫ : ৭৭, এবং ৬ : ১১৬ দ্রষ্টব্য)

সঠিকভাবে জানতে হলে কারো বক্তব্য বা যুক্তিতে প্রভাবিত না হয়ে সত্যের সন্ধানে অত্র বইয়ে অন্যত্র প্রদত্ত কুরআন মজীদের ১২টি সূরার তরজমা গভীর মনোযোগের সাথে কয়েকবার অধ্যয়ন করুন। ধর্মীয় সকল বিষয় আপনার কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। (২ :২৫৬-২৫৭)

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন, আল্লাহ তা'আলা সফল মানুষ হিসেবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের কথাই কুরআনে সর্বাধিক উল্লেখ করেছেন। সূরা বাইয়েনার ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের (চরিত্র বা স্বভাবের) পরিবর্তন ঘটায়।" (৮ : ৫৩, ১৩ : ১১)

একমাত্র কুরআনের আলোকে চরিত্র সংশোধন করেই মুসলমানরা আবার দুনিয়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হবে। (২৪ : ৫৫, ২১ : ১০৫-১০৬)

আল্লাহ বলেন, সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসারিত হয়েছে, আর মিথ্যা তো অপসারিত হবারই। (১৭ : ৮১)

আল্লাহ আরও বলেন, যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তাতে যা উত্তম (সত্য) তা গ্রহণ করে তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই বুদ্ধিমান। (৩৯ : ১৮)

এ পুস্তকে আলোচিত যে কোন বিষয়ের সঠিকতা নিয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সংশয় থাকলে তা পরিষ্কার করা সবারই ধর্মীয় কর্তব্য।

আবার কোন বক্তব্যকে মিথ্যা বা ভুল প্রমাণ করতে চাইলে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তা প্রমাণ করাও তার নৈতিক দায়িত্ব। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, এ পুস্তকে উল্লেখিত ১৬টি শির্ক ও বি'দআতি আমলের বৈধতা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর কী হতে

পারে? (দেখুন ৭৬ : ৩)। যারা জেনে বুঝে দুনিয়ার স্বার্থের লোভে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা এবং মাউযু ও যঈফ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে শির্‌কি ও বিদ'আতি আমলের প্রচার ও কর্ম পরিচালনা করে থাকে, তারা মানুষ শয়তান। আল্লাহ বলেন, "শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে" (৪৩ : ৩৭)। এদের অনুসারীদের জন্য প্রজোয্য আয়াত দেখুন—১৮ : ১০২-১০৪। যারা ভুল শিক্ষার কারণে ভ্রান্ত আমলে অভ্যস্ত তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। এদের ঈমান দুর্বল (২ : ১৬৫)। সত্য পরিষ্কার হবার পরেও তাদের অধিকাংশ সত্য গ্রহণ করবে না। (২ : ৬-৭)

এরা শয়তানের অনুসারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা তাদের নিকট সৎ পথ ব্যক্ত হবার পরও তা পরিত্যাগ করে, শয়তান ওদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়।" (৪৭ : ২৫)

সুধী পাঠক, পূর্ব পুরুষদের (দেখুন ২ :১৭০, ৩১ :২১, ৪৩ :২২) কিংবা ধর্মীয় নেতাদের (৯ :৩১) অথবা অধিকাংশ মুসল্লিদের (৬ : ১১৬) অন্ধভাবে অনুসরণ না করে কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করুন। সঠিক আমলের জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ বলেন, "যারা অজ্ঞতাবশত ভুল করে তারপর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাদের জন্য তো তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (১৬ : ১১৯)

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তওবা করো, আন্তরিক তওবা, সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন ও তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (৬৬ : ৮)

আল্লাহ আরও বলেন, যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সঠিক আমল করবে, তিনি তাদের পাপ বদল করে দেবেন পুণ্যের মাধ্যমে। (২৫ : ৭০)

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনায় সাহায্য করুন।

একটি বিশেষ অনুরোধ

সত্য গ্রহণ করুন, সত্য প্রচার করুন

আল্লাহ তা'আলা নবী করীমকে (সা.) পাঠিয়েছিলেন মানুষকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য। এ দীন আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যার অনুসরণে মানুষ এ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে। আর দীন হচ্ছে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলার জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ সর্বকালের সর্বযুগের সকল চাহিদা মিটানোর প্রয়োজনীয় সকল নীতিমালা পবিত্র কুরআন মাজীদে বিশদভাবে বিবৃত আছে। অথচ আজ কুরআনের অজ্ঞতা হেতু আমাদের অধিকাংশই না জেনে, না বুঝে শরীআত বিরোধী কাজ করে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হচ্ছে এবং দেশ ও জাতি আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভুল শিক্ষার কারণে মুসলমানগণ শির্ক ও বিদআতি আমলের মাধ্যমে অতি সহজে বেহেশতে যাওয়ার এবং দুনিয়াতে বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার মিথ্যা আশা নিয়ে হয়ে যাচ্ছে আত্ম-কেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও মুনাফিক। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে—যে কোনো উপায়ে হোক রাতারাতি সম্পদশালী হওয়া। যা নাকি বর্তমানে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

প্রতি যুগে প্রত্যেক কওমের কাছে নবী-রাসূল এসেছিলেন আল্লাহর নির্দেশিত জীবনবিধান মেনে চলার শিক্ষা দেয়ার জন্য। যেহেতু মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী/রাসূল আসবেন না, তাই আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্যকে কুরআনের বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনার জন্য উপদেশ দেয়া সমাজের আলেম সমাজের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শির্ক ও বিদ'আত মুক্ত আমলের উপদেশ দেয়া এবং কুরআনের বিধি-বিধান অমান্য করার পরিণাম, বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলা যে সকল গুনাহ আন্তরিক তওবা ব্যতীত মাফ করবেন না এবং যে সকল কর্মের পরিণাম চির জাহান্নাম বলে কুরআনে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক ও সচেতন করা সকল প্রকার ধর্মীয় আলোচনা ও উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ, আমাদের অধিকাংশ আজ অজ্ঞতা হেতু নানা ধরনের

কবীরা গুনাহতে লিপ্ত থেকে ছোটখাটো গুনাহ মাফের জন্য ভ্রান্ত আমলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। (৪ :৩১ ও ৫৩ :৩২)

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার অভাবই বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। কেবল কুরআনের বাস্তবায়নই হচ্ছে প্রকৃত ইবাদত অর্থাৎ সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ। এতেই নিহিত আছে ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের চাবিকাঠি। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম, ইমাম ও খতীব সাহেবগণ কুরআনের মূল বক্তব্য পরিহার করে সহীহ হাদীস বহির্ভূত মিথ্যা ও বানোয়াট আমলের প্রচার ও পরিচালনা অব্যাহত রেখে মুসল্লিদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে চলছে।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমি আলেম, খতিব ও ইমাম সাহেব যারা সমাজে ধর্মীয় বক্তব্য রাখেন, জুমু'আর নামাযে খুতবা দিয়ে থাকেন, পীর-আউলিয়াদের মধ্যে যারা তাদের ভক্তদেরকে ধর্মীয় উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং আলেম সমাজের যারা টেলিভিশনে আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন ও বিভিন্ন আমলের ফযীলত বর্ণনা করছেন, ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে তাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি।

বিভিন্ন সূরা, আয়াত এবং দু'আ-দরূদ-এর বেবুঝ তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনার পরিবর্তে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও এর ফযীলত এবং আল কুরআনের বিধি-বিধান অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য এবং দর্শক ও শ্রোতাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত ও ক্বিরআত করার অর্থাৎ বুঝে পাঠ করার উপদেশ দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

যে দেশের শিক্ষিত সমাজ কুরআন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়, সেই দেশ আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়ে স্বল্প সময়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে। এটা আল্লাহর ওয়াদা (দেখুন, আল-কুরআন ২১ :১০৫-১০৬ এবং ২৪ : ৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝার ও তার সঠিক বাস্তবায়নের তৌফিক দিন।

আমিন !